প্রকাশনার ৯৪ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে
Love for All
Hatred for None

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৭৯ বর্ষ | ২য় সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ শ্রাবণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ | ২৬ শাওয়াল, ১৪৩৭ হিজরি | ৩১ ওয়াফা, ১৩৯৫ হি. শা. | ৩১ জুলাই, ২০১৬ ঈসাব্দ

“সে ধর্ম ধর্ম নয়, যাতে সাধারণ সহানুভূতির শিক্ষা নেই এবং সে মানুষ মানুষ নয়, যার মধ্যে সহানুভূতির গুণ নেই। আমাদের খোদা কোন জাতির মধ্যে পার্থক্য করেন নি।... অতএব আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের এ সকল রীতি এ শিক্ষাই দিচ্ছে আমরাও যেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের প্রতি সৌজন্য ও সৌহার্দ্য দেখাই।”

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও
ইমাম মাহদী (আ.)

[পয়গামে সুলেহ্ (শান্তির বার্তা) পুস্তক, পৃ. ৫]

আবারও সত্যের সন্ধানে
২৮ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই টানা ৪ দিন ব্যাপী
টেলিফোন ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০১০
ফ্যাক্স ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০৩৭
ই-মেইল ঃ sslive@mta.tv

‘তোমরা যা ভালোবাস তা থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না। আর তোমরা যা-ই খরচ কর আল্লাহ্ নিশ্চয় সে বিষয়ে পুরোপুরি অবগত।’

(সূরা ঃ আলে ইমরান : ৯৩)

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন- “যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করে, নিশ্চয় সে আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য করে। যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করে, নিশ্চয় সে আল্লাহ্ তাআলার অবাধ্যতা করে। যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করে, নিশ্চয় সে আমার আনুগত্য করে। যে ব্যক্তি আমার আমীরের অবাধ্যতা করে, নিশ্চয় সে আমার অবাধ্যতা করে।”

(বুখারী, মুসলিম ও মেশকাত)।

“যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের শত শত আদেশের মধ্যে একটি ছোট আদেশকেও লংঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে।”

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা **হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)** রচিত **‘আল্ ইস্তিফতা’** পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহাদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

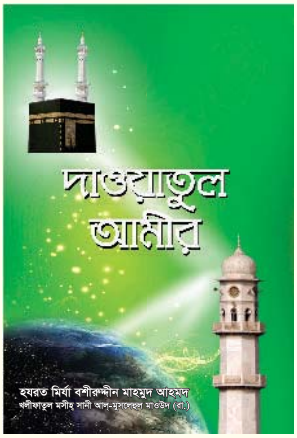

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **‘দাওয়াতুল আমীর’**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official | Commercial/Industrial | Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989

E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

ইসলাম শান্তি ও সার্বজনীন ধর্ম

'ইসলাম'-এর শাব্দিক অর্থ শান্তি। এই একটি মাত্র শব্দের মধ্যেই সমস্ত ইসলামী শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত সুন্দরভাবে এবং সংক্ষিপ্তাকারে প্রতিফলিত হয়েছে। ইসলাম শান্তির ধর্ম। এর শিক্ষা মানুষের স্বার্থ এবং আশা-আকাঙ্খার প্রতিটি ক্ষেত্রেই শান্তির গ্যারান্টি দান করে।

আজকের এই পৃথিবীর সবচাইতে মারাত্মক ব্যাধি হচ্ছে শান্তির অনুপস্থিতি। সমকালীন বিশ্বে, মানুষ, সামগ্রিকভাবে, বস্তুগত উন্নতির কারণে অনেক উঁচু স্তরে উঠতে পেরেছে। এটা সম্ভব হয়েছে মানবীয় প্রয়োজনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিহরণ জাগানো অগ্রগতির ফলে।

সন্দেহ নেই, মানব-সমাজের অধিকতর ভাগ্যবান অংশের লোকেরা অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বের বাসিন্দারা হাল যামানার বৈজ্ঞানিক উন্নতির সুফল ভোগ করছে অনেক বেশি করে। তৃতীয় বিশ্বও বেশ খানিকটা উপকৃত হয়েছে। কেননা, অগ্রগতির আলোক-রশ্মি সর্বাপেক্ষা অন্ধকার অঞ্চলগুলোর সেই সব গভীর প্রদেশেও প্রবেশ করেছে, যেখানে এখনও পর্যন্ত মানবসমাজের এক একটা অংশ দূর অতীতেই পরে আছে।

তথাপি, মানুষ সুখী নয়, পরিতৃপ্ত নয়। অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে ভীতি, শঙ্কা ও ভবিষ্যতের প্রতি অনাস্থা এবং সেই সঙ্গে অতীত থেকে প্রাপ্ত সব উত্তরাধিকারের প্রতিও অসন্তোষ।

এগুলোই হচ্ছে, সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের কয়েকটি যা সমসাময়িক বিশ্বের প্রকৃতিকে চ্যালেঞ্জ করছে। এটাই আবার উল্টোভাবে, মানুষের মনের অন্তস্তলে জন্ম দিচ্ছে তার অতীত অথবা তার বর্তমানের প্রতি, গভীর অসন্তোষ। বিশেষ করে এটাই প্রবিষ্ট হচ্ছে তরুণ প্রজন্মের চিন্তাধারার গঠন প্রক্রিয়ার গভীরে। মানুষ, তাই শান্তির অন্বেষায় ব্যাকুল।

পবিত্র কুরআন বার বার এ বিষয়টি পরিষ্কার করে বলেছে যে, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যার শিক্ষা মানুষের মন ও আত্মার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইসলাম জোর দিয়ে বলে যে, মানবমন বা মানবাত্মার মধ্যে প্রোথিত যে ধর্মের মূল তা স্থান ও কালের সীমাকে অতিক্রম করে যায়। মানবাত্মা অপরিবর্তনীয়। সুতরাং যে ধর্মের মূল প্রকৃতই মানবাত্মার অভ্যন্তরে প্রোথিত, তা অপরিবর্তনশীল। অবশ্য, যদি তা মানুষের পরিবর্তনশীল অবস্থাদির মধ্যে খুব বেশী জড়িয়ে না পড়ে, তা সে যে কোন যুগই হোক, আর মানুষ যত বেশি প্রগতিই সাধন করুক। যদি কোন ধর্ম, সেই সমস্ত নীতির উপরে অটল থাকে, যা মানবাত্মা থেকে স্বত: উৎসারিত, তবে সেই ধর্মের পক্ষে একটি সার্বজনীন ধর্মরূপে পরিণতি লাভ করার যৌক্তিক সম্ভাবনা রয়েছে।

অন্যান্য মানুষের মঙ্গলের জন্য সর্বক্ষণ সতর্ক থাকা

ইসলাম অপরের দুঃখ কষ্ট ও দুর্ভাগ্যের প্রতি সংবেদনশীলতা ও সহানুভূতিশীলতার সৃষ্টি করে। ইসলাম মানুষের ভালবাসার পরিধি ও ক্ষমতার প্রসার ঘটায় এবং তা শুধু স্বজন ও স্বজাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে না; বরং তা আল্লাহ্‌র সমগ্র সৃষ্টির জন্যই সম্প্রসারিত করে।

আল্লাহ্ ছাড়া শান্তি সম্ভব নয়

'আল্লাহ্ ছাড়া শান্তি সম্ভব নয়'-এই ফর্মূলা ছাড়া মানুষ না তার নিজেকে নিয়ে শান্তিতে থাকতে পারে, না সমাজের জন্য শান্তি আনতে পারে। আল্লাহ্‌র ভালবাসাই কেবল তাঁর সৃষ্টির প্রতি সত্যিকারের মমতা জন্মাতে পারে, পারে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের মর্যাদা দিতে। সৃষ্টির স্তর যত উন্নতি লাভ করে তা স্রষ্টার তত কাছাকাছি হয়, তত শক্তিশালী হয়ে উঠে স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির বন্ধন।

মানুষ তখন অধিকতর উচ্চ ও মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রদ্ধা করতে থাকে অপরাপর মানুষকে, অর্থাৎ- মানুষ তার স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা ও কর্তব্যের খাতিরে গোটা মানবজাতিকেই শ্রদ্ধা করতে থাকে। অতএব, যে কেউ বলতে পারে যে, এটা তো খোদার প্রতি সেই ভালবাসাই, যা তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

চূড়ান্ত ইসলামী দর্শন এটাই যে, আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাবর্তন ছাড়া কারো পক্ষেই শান্তি লাভ করা সম্ভব নয়; এবং সেই শান্তি ছাড়া সমাজেও শান্তি স্থাপন করা সম্ভব নয়। আত্মকেন্দ্রী স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার যাবতীয় মানবীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য এবং তা সবই শূণ্যতায় মিলিয়ে যাবে।

[হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর 'বিশ্ব শান্তি: সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান' পুস্তক থেকে উদ্ধৃত]

ইসলাম প্রেমীদের উদ্দেশ্যে এক আন্তরিক নিবেদন

মহান স্রষ্টার কাছে আমাদের সকরুণ প্রার্থনা, আমাদের বর্তমান দেশীয় তথা বিশ্ব-প্রেক্ষাপটে প্রকৃতই ইসলাম প্রেমী যারা তাদের উপলব্ধিতে উপরোক্ত সত্য বিকশিত হোক, আলোকিত হয়ে উঠুক তাদের অন্তর্লোক, দৃশ্যমান হোক তা ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন তথা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে।

হে পরম করণাময়, তুমি শীঘ্রই আমাদের সেই দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য দান কর, আমীন!

সূচিপত্র

৩১ জুলাই, ২০১৬

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

'বারাহীনে আহমদীয়া' ৬
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৯
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
১৭ জুন, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা**

ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) ১৭
প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২০
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
১০ জুন, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা**

বয়আতের শর্তসমূহ এবং ২৮
একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য
হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

কলমের জিহাদ ৩০
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

প্রশান্তি লাভে একান্তভাবে কাম্য ৩২
ঐশীপ্রেম
মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

জামা'তী কর্মকর্তা নির্বাচন এবং ৩৬
তাদের দায়-দায়িত্ব
(কুরআন, হাদীস ও খলীফাগণের নির্দেশনার আলোকে)
মওলানা মোহাম্মদ আরিফুর রহিম

ইসলামের নামে ৩৯
কেন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড
মাহমুদ আহমদ সুমন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ৪১
শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

সংবাদ ৪৩

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৪৭

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে ৪৮
হুযূর (আই.)-এর
বিশেষ দোয়ার তাহরীক

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا
تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ
اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا
يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২। আর আল্লাহ্ যদি মানুষকে তার অন্যায় কাজের কারণে (তাৎক্ষণিক) শাস্তি দিতেন তাহলে কোন প্রাণীকেই তিনি এ (পৃথিবীতে জীবিত) ছাড়তেন না[১৫৫৪]। কিন্তু তিনি এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তাদেরকে (আত্মশুদ্ধির জন্য) অবকাশ দিয়ে থাকেন। তবে তাদের (শাস্তির) নির্ধারিত মেয়াদ যখন এসে পড়ে তখন তারা এক মুহূর্ত পিছনেও থাকতে পারে না এবং সামনেও এগুতে পারে না।

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ
اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ؕ لَا
جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩। আর তারা নিজেদের বেলায় যা অপছন্দ করে তা আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারণ করে থাকে। আর তাদের মুখ মিথ্যা (দাবী করে) বলে, সব মঙ্গল তাদের জন্যই রয়েছে। নিঃসন্দেহে তাদের জন্য আগুন (নির্ধারিত) রয়েছে। আর (সেখানে) পরিত্যক্ত অবস্থায় তাদের ছেড়ে দেয়া হবে।

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ
فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ
وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٤﴾

৬৪। আল্লাহ্‌র কসম! তোমার পূববর্তী জাতিগুলোর মাঝেও আমরা অবশ্যই রসূল প্রেরণ করেছিলাম। কিন্তু শয়তান তাদের কার্যকলাপ তাদের কাছে সুন্দর করে দেখিয়েছিল। অতএব আজও সে-ই তাদের অভিভাবক (সেজে বসে আছে), অথচ তাদের জন্য কষ্টদায়ক আযাব (নির্ধারিত) রয়েছে।

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ
الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً
لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫। আর আমরা তোমার প্রতি এ কিতাব কেবল এ জন্যই অবতীর্ণ করেছি যেন তুমি সেই বিষয়ে তাদের বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দাও যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করে এবং (এ ছাড়াও) যারা ঈমান আনবে (এ কিতাব) যেন তাদের পথনির্দেশনা ও রহমতের কারণ হয়।

১৫৫৪। শাস্তি বিলম্বিত হয়ে থাকে। কারণ যদি আল্লাহ্ তা'লা সর্বপ্রকার শাস্তি তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োগ করতেন তাহলে দুনিয়া অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত এবং ভূ-পৃষ্ঠের সকল জীব-জন্তু বিলুপ্ত হয়ে যেত। পাপের কারণে মানুষ অকালে শেষ হয়ে গেলে জীবজন্তু ও পশুপাখি বেঁচে থাকার কোন প্রয়োজন থাকতো না। মানুষেরই দরকারে ও উপকারে এদের সৃষ্টি। অতএব মানুষের বিলুপ্তির সাথে সাথে সেগুলোও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

হাদীস শরীফ

কিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকের জন্য শাফাআত করবে

কুরআন :

আকিমিস্ সালাতা লিদুলুকিশ্ শামসি ইলা গাসাকিল লায়লি ওয়া কুরআনাল ফাজরে, ইন্না কুরআনাল ফাজরে কানা মাশহুদা (সূরা বনী ইসরাঈল : ৭৯)।

অর্থাৎ–তুমি সূর্য ঢলে যাবার পর হ'তে রাতের ঘোর অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং প্রভাতে কুরআন পড়াকে গুরুত্ব দাও, নিশ্চয় প্রভাতে কুরআন পাঠ এমন (একটি বিষয়) যে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হয়।

হাদীস :

আন আবি উমামাতা ক্বালা সামি'তু রসূলুল্লাহে ইয়াকুলু ইকরাউল কুরআনা ফাইন্নাহু ইয়া'তি ইয়াওমাল কিয়ামাতি শাফিআন লিআসহাবিহি।

অর্থাৎ হযরত আবূ উমামা হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি : তোমরা কুরআন পড়ো। কারণ কিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকের জন্য শাফাআত করবে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা :

পবিত্র কুরআন মানবজাতির জন্য পথ-প্রদর্শক। এর মধ্যে মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান বিদ্যমান। এমন এক পরিপূর্ণ কিতাব যার মাঝে আধ্যাত্মিক ব্যাধি হ'তে মুক্তিদানকারী ব্যবস্থাপত্র রয়েছে। কিন্তু পরিতাপ ঐ জাতি যাদেরেকে এ মহান গ্রন্থ দেয়া হয়েছে তারা এথেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আর তাই এ ***খায়রে উম্মত*** আজ অধ:পতনের অথৈ গহ্বরে পতিত। নামাযের সাথে পবিত্র কুরআনের সম্পর্ক রয়েছে। খোদার নৈকট্যের একমাত্র সহজ উপায় হলো নামায। এ নামাযের মধ্যে খোদার বাণী যেভাবে ভক্তি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়া যায় অন্য সময় তা সম্ভব নয়। কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা প্রভাতের তেলাওয়াতের মহিমা বর্ণনা করেছেন। এর দু'টি অর্থ হ'তে পারে। প্রথমত: তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়িয়ে কুরআন পাঠ আর দ্বিতীয়ত: ফজরের নামায আদায়ের পর কুরআন পাঠ। এরূপ কর্ম খোদার নিকট খুবই প্রিয়। যে ব্যক্তি খোদার স্মরণে তার প্রতিদিনের কর্ম সূচনা করে দিনের বাকী অংশটুকু তার উত্তমভাবে কাটানোটাই স্বাভাবিক।

হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, কুরআন পাঠ কারীর জন্য কিয়ামতের দিন কুরআন শাফাআতকারী হবে। এ হ'তে বুঝা যায় কুরআন পাঠের গুরুত্ব কত বড়। আজ আমরা যারা আখারীনদের দলভুক্ত তাদের উপর কুরআন প্রচারের মহান দায়িত্ব। এ উদ্দেশ্যে সফলতা লাভের জন্য আমাদের সকলকে কুরআন তেলাওয়াতের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং এর শিক্ষার উপর আমল করতে হবে। সঠিকভাবে নাযেরা পড়া শিখতে হবে। তারপর অর্থ শিখতে হবে। প্রতিদিন সকালে কুরআন তেলাওয়াতে অভ্যস্ত হ'তে হবে। প্রতিটি আহমদী বাড়ী হ'তে প্রভাতকালে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের ধ্বনি শুনা যেতে হবে। তবেই আমরা কুরআন প্রচারে সফলতা লাভ করব। ইসলাম ও হযরত নবী করীম (সা.) কুরআনেরই অপর নাম। তাই কুরআনের প্রতি শ্রদ্ধা ও কুরআন পাঠ না করলে উপরোক্ত দু'টি বিষয়ই অজানা হয়ে যাবে। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) বলেছেন, যে কুরআনকে ইজ্জত দিবে আকাশে তাকে ইজ্জত দেয়া হবে।

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে তাঁর কালাম পড়ার ও বুঝার তৌফিক দিন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

মন্দস্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিকে খোদা তা'লা কি সাহায্য করেন?

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

সুতরাং প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারে, খোদা কি কখনো এই রীতি গ্রহণ করেছেন এবং যখন হতে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তখন হতে তিনি কি কখনো এরূপ কাজ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি এরূপ মন্দ স্বভাববিশিষ্ট ধূর্ত, অশিষ্ট এবং খোদার নামে মিথ্যা কথা বলে এবং ত্রিশ বছর ধরে প্রতিদিন প্রতি রাত্রে খোদা তা'লার নামে মিথ্যা কথা বলে নিজের মনগড়া এক নতুন ইলহাম বানিয়ে লোকদের বলে বেড়ায় যে, খোদা তা'লার পক্ষ হতে এই ওহী অবতীর্ণ হয়েছে; আর খোদা তা'লা এরূপ ব্যক্তিকে ধ্বংস করার পরিবর্তে শক্তিশালী নিদর্শনাবলী দ্বারা তাকে সাহায্য করেন? তার দাবী সপ্রমাণ করার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আকাশে চন্দ্র ও সূর্যে গ্রহণ লাগিয়ে দেন? অনুরূপভাবে যে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্বের কিতাবসমূহে, কুরআন শরীফে, হাদীসসমূহে এবং স্বয়ং তার কিতাব বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ ছিল তা পূর্ণ করে জগদ্বাসীকে দেখান? এবং সত্যবাদীর ন্যায় ঠিক শতাব্দীর শিরোভাগে তাকে প্রেরণ করেন? এবং ঠিকই ক্রুশের প্রাধান্যের সময় যাকে খন্ডন করার জন্য ক্রুশ ধ্বংসকারী প্রতিশ্রুত মসীহের আগমন অবধারিত ছিল, তাকে এই দাবির সাথে দাঁড় করিয়ে দেন? এবং তার সমর্থনে দশ লক্ষের অধিক নিদর্শন দেখান? এবং পৃথিবীতে তাকে সম্মান প্রদান করেন? এবং পৃথিবীতে তার কবুলিয়ত বিস্তার করেন? এবং শত-শত ভবিষ্যদ্বাণী তার পক্ষে পূর্ণ করেন? এবং প্রতিশ্রুত মসীহের আবির্ভাবের জন্য নবীগণ কর্তৃক নির্ধারিত দিনে তাকে সৃষ্টি করেন? এবং তার দোয়া কবুল করেন? এবং তার বর্ণনায় প্রভাব সৃষ্টি করেন? একইভাবে তাকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন? অথচ তিনি জানেন, সে একজন মিথ্যাবাদী এবং অন্যায়ভাবে জেনে-বুঝে তাঁর প্রতি মিথ্যা ওহী আরোপ করে? তোমরা কি বলতে পার আমার পূর্বে খোদা তাআলা অন্য কোন মুফতারির (যে ব্যক্তি খোদার নামে মিথ্যা কথা বলে) প্রতি এরূপ দয়া ও করুণা প্রদর্শন করেছিলেন?

অতএব, হে খোদার বান্দারা! উদাসীন হয়ো না। যেন শয়তান তোমাদের কুপ্ররোচণা না দেয়। নিশ্চিতভাবে জেন, ঐ ওয়াদা পূর্ণ হল-যা আদি হতে খোদার পবিত্র নবীগণ করে আসছেন। খোদার প্রেরিত পুরুষগণ ও শয়তানের মধ্যে আজ শেষ যুদ্ধ। এটি ঐ-সময় ও ঐ-যুগ-যার প্রতি দানিয়াল নবীও ইঙ্গিত করেছিলেন। আমি সত্যবাদীদের জন্য একটি আশিষরূপে এসেছি। কিন্তু আমাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা হয়েছে। আমাকে কাফের ও দাজ্জাল আখ্যা দেয়া হয়েছে। এরূপ হওয়াই জরুরী ছিল-যাতে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে যায়, যা 'গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম' আয়াতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। কেননা খোদা **'মুনইম আলাইহিম'** এর ওয়াদা করে এই আয়াতে বলেছেন' এই উম্মতের মধ্যে ঐসব ইহুদীও সৃষ্টি হবে, যারা ইহুদী আলেমদের সদৃশ হবে। তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে ক্রুশে হত্যা করতে চেয়েছিল। তারা ঈসা (আ.)-কে কাফের, দাজ্জাল ও নাস্তিক আখ্যা দিয়েছিল। এখন চিন্তা কর, এটি কোন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। এটি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল, প্রতিশ্রুত মসীহ্ এই উম্মতের মধ্য হতে আগমন করবে। এজন্য তার যুগে ইহুদী স্বভাববিশিষ্ট মানুষও সৃষ্টি হয়ে যাবে-যারা নিজেদের আলেম বলবে। অতএব আজ তোমাদের দেশে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে গেছে। এমন আলেম যদি না থাকত, তাহলে এই সময় কাল পর্যন্ত এই দেশের সব মুসলমান অধিবাসী আমাকে গ্রহণ করত। সুতরাং সকল অস্বীকারকারীর পাপ এদের ঘাড়ে চাপবে। এরা ন্যায়পরায়ণতার প্রাসাদে না নিজেরা প্রবেশ করছে, না স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের প্রবেশ করতে দিচ্ছে। এরা কতই না ষড়যন্ত্র করছে! এদের গৃহে সংগোপনে কতই-না শলা-পরামর্শ করা হচ্ছে। কিন্তু এরা কি খোদার উপর জয়যুক্ত হয়ে যাবে? এরা কি সর্বশক্তিমান খোদার ইচ্ছায় বাদ সাধতে পারবে-যার সম্বন্ধে মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। এরা এই দেশের খল প্রকৃতির আমীরদের এবং হতভাগ্য ঐশ্বর্যশালী বস্তুবাদী লোকদের উপর ভরসা করছে। কিন্তু খোদার দৃষ্টিতে এরা কি? খোদার দৃষ্টিতে এরা মৃত কীট মাত্র।

['তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন' পুস্তক, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৭৭-৭৯]

Facsimile of the original Urdu title page for Part I, printed in 1880.

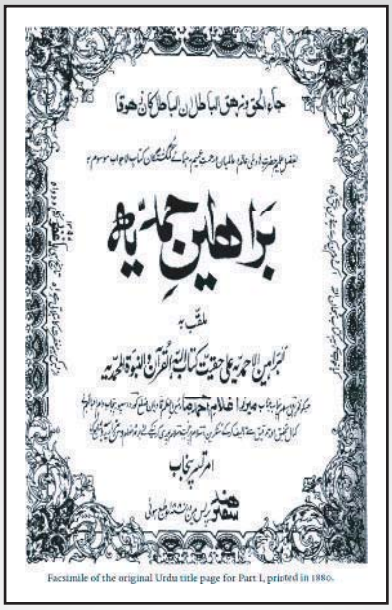

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

‘বারাহীনে আহ্‌মদীয়া’

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

(২০তম কিস্তি)

প্রথম অধ্যায়

কুরআন শরীফের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য-প্রমাণাদির বিবরণ প্রসঙ্গে:

এ অধ্যায়ে নির্ধারিত প্রমাণাদি উপস্থাপনের পূর্বে ভূমিকাস্বরূপ এমন কিছু বিষয় বর্ণনা করা আবশ্যক যা পরবর্তী বেশিরভাগ প্রমাণাদির মর্ম উদঘাটন এবং সেসবের অবস্থা ও প্রকৃতি বোঝার জন্য সার্বজনীন মানদন্ড হবে। নিম্নে ভূমিকামূলক কথাগুলো লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

প্রথম ভূমিকা: বাহ্য সাক্ষ্যাবলী বলতে বাইরের সেসব ঘটনাকে বোঝায় যা কার্যত এমন এক অবস্থায় বিরাজমান, যাতে প্রণিধানে প্রমাণিত হয় যে, এ গ্রন্থটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছে অথবা এর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হওয়ার আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়। অপরদিকে অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য বলতে কোন গ্রন্থের নিজস্ব সেসব উৎকর্ষতা বুঝায় যা স্বয়ং সে গ্রন্থে বিদ্যমান আর যা সম্পর্কে চিন্তা করলে বিবেক নিশ্চিতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য যে, তা খোদার উক্তি বা বাণী এবং তা রচনায় মানুষ সক্ষম নয়।

দ্বিতীয় ভূমিকা: পবিত্র কুরআনের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বাইরের যেসব সাক্ষ্য রয়েছে তা চার প্রকার। প্রথমটি হলো তা, যা সংশোধনের মুখাপেক্ষী বিষয়াবলী থেকে গৃহীত। দ্বিতীয় প্রকার সাক্ষ্য এমন বিষয়াবলী থেকে নেয়া যা পূর্ণতার মুখাপেক্ষী। তৃতীয় সাক্ষ্য সেসব বিষয় থেকে নেয়া যা ক্ষমতা বা ঐশী শক্তির সাথে সম্পর্ক রাখে। আর চতুর্থ শ্রেণির প্রমাণ তা, যা অদৃশ্য বিষয়াবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু যে সব প্রমাণ পবিত্র কুরআনের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য-প্রমাণ, তার সবক'টি খোদার ক্ষমতা বা শক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়াবলী হতে গৃহীত। উল্লিখিত সাক্ষ্য বা প্রমাণাদির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।

সংশোধনের মুখাপেক্ষী বিষয় বলতে অবিশ্বাস, ঈমানহীনতা, শির্ক ও অপকর্ম বুঝায় যা আদম সন্তান সত্য-সঠিক বিশ্বাস ও সৎকর্মের স্থলে ধারণ করে রাখে আর যা সার্বিকভাবে পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তৃত হওয়ার কারণে খোদার চিরস্থায়ী করুণা এর সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

পরিপূর্ণতার মুখাপেক্ষী বিষয় বলতে সেসব শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয় বোঝায় যা ঐশী গ্রন্থে অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিযুক্ত অবস্থায়

বিদ্যমান আর জ্ঞানের উৎকর্ষতার নিরিখে যাচাই করলে এর ত্রুটি ও অপূর্ণতা প্রমাণ হয়ে যায়। এ কারণে তা এমন এক ইলহামী গ্রন্থের মুখাপেক্ষী যা তাকে পরম উৎকর্ষতার পর্যায়ে উপনীত করবে।

ঐশী ক্ষমতার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয় দু'প্রকার :

১) বহিরাগত সাক্ষ্য: বহিরাগত সাক্ষ্য বলতে সেসব বিষয় বুঝায় যা মানবীয় প্রচেষ্টার কোন ভূমিকা বা মাধ্যম ছাড়াই খোদার পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয় আর তা সকল তুচ্ছ বিন্দুকে সেই মর্যাদা, সম্মান, মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করে যা অর্জিত হওয়া যুক্তির নিরিখে সাধারণত অসম্ভব মনে করা হয় এবং যার দৃষ্টান্ত ধরাপৃষ্ঠে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না ।

২) অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য - বলতে ঐশী গ্রন্থের সেসব বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যাবলী বুঝায়, মানবীয় শক্তি-বৃত্তি যার সামনে দাঁড়ানোর সামর্থ্য রাখে না এবং যা সত্যিকার অর্থে অতুলনীয় ও অনন্য প্রমাণিত হয়ে এমন অদ্বিতীয় ক্ষমতাবান এক সত্তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে যেন তা খোদা দর্শনের আয়নাস্বরূপ।

অদৃশ্য বিষয়: বলতে সেসব বিষয় বুঝায় যা এমন এক ব্যক্তির মুখ হতে নিঃসৃত, যার সম্পর্কে নিশ্চিত কথা হলো, সেসব বিষয় বর্ণনা করা সম্পূর্ণভাবে তার শক্তির ঊর্ধ্বে; অর্থাৎ সেসব বিষয় সম্পর্কে ভাবলে এবং সে ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে প্রণিধান করলে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, সেসব বিষয় তার জানা ও দেখা জগতের অন্তর্ভূক্তও নয় আর চিন্তা বা অভিনিবেশের মাধ্যমেও তা লাভ হতে পারে না। অধিকন্তু যুক্তির নিরিখে তার সম্পর্কে এই ধারণা করা যৌক্তিক নয় যে, সে হয়ত কোন পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে তা অর্জন করে থাকবে যদিও সেসব বিষয় অর্জন করা হয়ত অন্য কোন ব্যক্তির জন্য সাধ্যাতীত বিষয় নয়।

অতএব এই গবেষণার ফলে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, অদৃশ্য বিষয়াদি ব্যক্তিসম্পর্কিত ও আপেক্ষিক বিষয় অর্থাৎ এমন বিষয়, যা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গের প্রতি আরোপিত হলে তা অদৃশ্য বিষয় আখ্যা পাওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। কিন্তু একই বিষয় যখন অন্য কতক ব্যক্তির প্রতি আরোপ করা হয়, সেই যোগ্যতা তাদের মাঝে প্রমাণ হয় না।

উপমা

(ক) যায়েদ এক ব্যক্তি যে আমাদের এ যুগে জন্মগ্রহণ করেছে। বকর অপর এক ব্যক্তি যে যায়েদের ৫০ বছর পর জন্মগ্রহণ করেছে, যার যুগ যায়েদ পায়নি এবং তার ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত হওয়ার কোন জাগতিক বা বাহ্যিক মাধ্যমও তার ছিল না। অতএব বকর যেসব ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে, যদিও তার জন্য তা অদৃশ্য বিষয় নয় কারণ তা তারই ঘটনা, তার দেখা ও জানা জগত। কিন্তু সেসব ঘটনা সম্পর্কে যায়েদ যদি শতভাগ সঠিক সংবাদ প্রদান করে, তাহলে বলা হবে যায়েদ অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দিয়েছে। কেননা, সেসব বিষয় যায়েদের জন্য জানা ও দেখা বিষয় নয়, অধিকন্তু তা জ্ঞাত হওয়ার জন্য যায়েদের আয়ত্তে কোন বাহ্যিক মাধ্যমও ছিল না।

(খ) বকর একজন দার্শনিক, যে দীর্ঘকাল গভীর মনোযোগ সহকারে দর্শনশাস্ত্রের পুস্তকাদি অধ্যয়ন এবং এতে চিন্তা-প্রণিধানের কারণে সূক্ষ্ম দার্শনিক সত্য উদঘাটনের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করেছে। যৌক্তিক জ্ঞান অর্জন, পূর্ববর্তীদের রচনাবলী অধ্যয়ন এবং প্রাচীন পন্ডিতদের গবেষণা ভান্ডার হস্তগতকরণ; অধিকন্তু অব্যাহত প্রণিধান, অনুশীলন, মাথা খাটানো এবং যুক্তি বিদ্যার নির্ধারিত নিয়মনীতি অনুসরণের ফলশ্রুতিতে জ্ঞানের অনেক নিগুঢ় সত্য ও সুনিশ্চিত এবং সুদৃঢ় প্রমাণাদি তার কণ্ঠস্থ। অপরদিকে যায়েদ এমন এক ব্যক্তি, যার সম্পর্কে এটি প্রমাণিত বিষয় যে, সে যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের একটি অক্ষরও পড়েনি, না দর্শন শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান আছে। আর চিন্তা ও অভিনিবেশকে কাজে লাগানোর তার কোন অভ্যাস ও অভিজ্ঞতাও নেই। কোন জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাশীল ব্যক্তির সাথে তার মেলামেশা বা ওঠাবসাও নেই বরং নিরেট নিরক্ষর আর সবসময় অশিক্ষিতদের সাথে ওঠাবসা করে।

অতএব বকর যেসব জ্ঞান প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে কষ্ট ও সাধনার গুণে অর্জন করেছে তা তার জন্য অদৃশ্য কোন বিষয় নয়, কেননা সে সেই শিক্ষা অর্জন করেছে দীর্ঘকালের কঠোর শ্রম ও সাধনার ফলশ্রুতিতে। কিন্তু যায়েদ সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষর হয়েও যদি জ্ঞান ও দর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যাবলী এত পরিস্কারভাবে বর্ণনা করে যাতে তিল পরিমাণও অসামঞ্জস্যতা থাকে না বরং, উন্নত জ্ঞানের স্পর্শকাতর ও সুমহান শাশ্বত সত্য বিষয়াদিকে এত উত্তমভাবে প্রকাশ করে যে, এতে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা দৃশ্যমান হয় না।

অধিকন্তু প্রজ্ঞার সূক্ষ্ম দিকগুলোর এমন এক পূর্ণ সমাহার উপস্থাপন করে যা ইতোপূর্বে এত নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা অন্য কোন বিজ্ঞব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয়নি। অতএব সকল বিষয়ে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যাবলীসমৃদ্ধ তার নিখুঁত বর্ণনা অদৃশ্য বিষয়ের অন্তর্গত হবে। কেননা সে সেসব বিষয় বর্ণনা করেছে যা বর্ণনা করা তার শক্তি, যোগ্যতা এবং জ্ঞান-বুদ্ধির উর্ধ্বে এবং তা বর্ণনা করার জন্য তার কাছে সাধারণ ও প্রচলিত উপকরণের কোন কিছুই ছিল না।

(গ) বকর একজন পাদ্রি বা পন্ডিত বা অন্য কোন ধর্মের আলেম ও বিদ্বান এবং ছোট-বড় সব বিষয়ে দক্ষ। সে নিজ জীবনের একটি বড় অংশ বহু বছরের শ্রম ও সাধনায় অতিবাহিত করে স্বীয় ধর্মের অতি সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ্য বিষয়াবলী উদঘাটন করেছে। আর সে ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থে যেসব সঠিক ও ভ্রান্ত বিষয়াদি রয়েছে বা যেসব সূক্ষ্ম ধর্মীয় তত্ত্ব অন্তর্নিহিত রয়েছে, তার পুরোটাই দীর্ঘদিনের চিন্তাভাবনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আয়ত্ত করেছে।

অপরদিকে যায়েদ এমন এক ব্যক্তি যার সম্পর্কে প্রমাণিত বিষয় হলো, সে নিরক্ষর হওয়ার কারণে কোন বই পড়তে পারে না। বকর যদি সেসব বই-পুস্তক থেকে কিছু বিষয়, মাসলা-মাসায়েল বা ঘটনাবলী বর্ণনা করে তা অদৃশ্য বিষয় বলে গণ্য

হবে না। কারণ বকর উৎকৃষ্ট শিক্ষার মাধ্যমে এবং দীর্ঘকাল অনুশীলনের ফলশ্রুতিতে এসব গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়াদী সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। কিন্তু যায়েদ, যে পুরোপুরি নিরক্ষর, সে যদি এমন সব গভীর সত্য বিষয়াদি বর্ণনা করে যা পুরোপুরী ওয়াকিফহাল ব্যক্তি ছাড়া অবগত হওয়া সাধারণত অসম্ভব, আর সেসব গ্রন্থের এমন সব সূক্ষ্ম সত্য তথ্য প্রকাশ করে যা বিশেষ বিশেষ জ্ঞানী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জানা থাকে না, একই সাথে এসবের এমন সব ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে সাধারণত যা চিহ্নিত করা অত্যন্ত সূক্ষ্মদৃষ্টি ছাড়া অসম্ভব। অধিকন্তু সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ ও গবেষণার এই কাজে যদি উৎকর্ষতার দিক থেকে এমন পরাকাষ্ঠা রাখে যা-কি-না নযীরবিহীন তাহলে তার সম্পর্কে একথা বলা সত্য ও যথার্থ হবে যে, সে অদৃশ্য বিষয়াদি বর্ণনা করেছে।

ব্যাখ্যা

কোন আপত্তিকারী এই ভূমিকায় হয়ত এই আপত্তি করতে পারে যে, ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে যেসব সহজ ও সাদামাটা সত্য-তথ্য, সংকলিত ও লিপিবদ্ধ রয়েছে তা শ্রুত মাধ্যম ব্যবহার করেও বর্ণনা করা সম্ভব, এর জন্য শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক নয়। কেননা নিরক্ষর ব্যক্তি কোন ঘটনা কোন শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে শুনে বর্ণনা করতেই পারে। এগুলো এমন কোন সূক্ষ্ম জ্ঞানগর্ভ বিষয় নয় যা রীতিমত পড়ালেখা ছাড়া অবগত হওয়া অসম্ভব হতে পারে।

এমন আপত্তিকারীকে এই প্রশ্ন করা যেতে পারে, তোমাদের গ্রন্থাবলীতে এমন কোন সূক্ষ্ম সত্য আছে কী যা বড় আলেম ও বিদগ্ধ পন্ডিত ছাড়া অন্য কোন মানুষের পক্ষে উদঘাটন করা অসম্ভব, বরং কেবল সেসব লোকের ধ্যান-ধারণা সর্বপ্রথম এসব সত্যের প্রতি নিবদ্ধ হয় যারা দীর্ঘকাল সেসব গ্রন্থ অধ্যয়নে রক্ত পানি করেছে এবং বিভিন্ন বিদ্যাপীঠে গিয়ে দক্ষ শিক্ষকদের কাছে জ্ঞান অর্জন করেছে? এই প্রশ্নের উত্তর সে যদি এটি দেয় যে, এমন উন্নত পর্যায়ের সূক্ষ্ম সত্য আমাদের গ্রন্থে নেই বরং এসব গ্রন্থ অগভীর, ভাসা-ভাসা ও অন্তঃসারশূন্য বিষয়াদিতে পরিপূর্ণ যা সাধারণ মানুষও সামান্য চেষ্টায় তা অবগত হতে পারে আর একজন অপরিপক্ক বুদ্ধির বালকও ভাসা ভাসা ধারণা নিয়ে এর গভীরতায় পৌঁছুতে পারে। যা জানা কোন জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে না,বরং কার্যত তা সেসব পুস্তক-পুস্তিকার মতই যাতে কল্পকাহিনী লেখা হয় বা শুধু শিশু-কিশোর ও সাধারণ পাঠকের জন্য লেখা হয়ে থাকে! এমন নিম্নমানের বই-পুস্তকের জন্য আক্ষেপ। কেননা এটি অত্যন্ত পরিস্কার ও স্পষ্ট বিষয় যে যদি কোন গ্রন্থের বিধৃত বিষয়াদি কেবল সাধারণ স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের গন্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকে আর তা সূক্ষ্ম-সুন্দর সত্যের মানদন্ডে অত্যন্ত নিম্নমানের প্রমাণিত হয় তাহলে সে গ্রন্থ কোন উন্নত গ্রন্থ বলে আখ্যায়িত হয় না বরং তা বিবেকবানদের দৃষ্টিতে তেমনই অগভীর ও নিম্নমানের হয়ে থাকে যেমনটি কি-না এতে বর্ণিত বিষয়াদি অগভীর। আর এতে বিধৃত বিষয়াদি এমন নয় যাকে প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা যেতে পারে বা যা সুমহান সত্যের মানে অধিষ্ঠিত বলে মনে করা যেতে পারে।

অতএব যে ব্যক্তি নিজের ইলহামী গ্রন্থ সম্পর্কে দাবী করে যে এতে বর্ণিত সকল বিষয় অগভীর ও হালকা আর তা সেই সর্বাঙ্গীন সূক্ষ্ম সত্যের ক্ষেত্রে রিক্ত ও বঞ্চিত, যা অবগত হওয়া জ্ঞানী, চক্ষুষ্মান ও চিন্তাশীলদেরই বিশেষত্ব; এমন ব্যক্তি নিজেই নিজ গ্রন্থের অসম্মান করে আর এর ফলে তার অহংকারও বজায় থাকতে পারে না। কেননা যে বিষয়ের অন্তর্নিহিত মর্ম উদঘাটনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষও তার সমকক্ষতা অর্জন করে, সে এমন কোন জ্ঞানভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না যা সাধারণ মানুষের মাঝে তাকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দেবে বা তাকে পন্ডিত বা জ্ঞানী উপাধিতে ভূষিত করবে; বরং সে-ও পশুতুল্য সাধারণ মানুষেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা তার জ্ঞান ও তত্ত্ব সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণ মানুষ থেকে উন্নতমানের নয়।

নিঃসন্দেহে এমন অসার ও নিম্নমানের গ্রন্থাবলীতে বিধৃত বিষয়াদি অদৃশ্য জ্ঞানের অন্তর্গত হবে না। এছাড়া অতিরিক্ত শর্ত হলো, সেসব গ্রন্থের শিক্ষামালা এত ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও সুপরিচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় যার সম্পর্কে এই ধারণা রাখা যুক্তিযুক্ত হবে যে, প্রত্যেক নিরক্ষর ও অশিক্ষিত মানুষও একটু চিন্তা করলেই এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হতে পারে। কেননা এসবের বিষয়বস্তু যদি সুপ্রচারিত ও সুবিদিত না হয় তাহলে তা যত অন্তঃসারশূন্য ও স্থূল কথাই হোক না কেন যে ভাষায় সেসব গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে সে ভাষা সম্পর্কে অনবহিত ব্যক্তির জন্য তা অজানা-অদেখা বা অদৃশ্য বিষয়ই গণ্য হবে। এটি সে পরিস্থিতিতে হবে যখন স্বীয় ইলহামী গ্রন্থ সম্পর্কে কোন জাতির দৃষ্টিভঙ্গি এটিই হয়ে থাকে যে, তাদের ঐশীগ্রন্থ সূক্ষ্ম সত্য থেকে রিক্তহস্ত ও বঞ্চিত।

কিন্তু কোন জাতির মতামত যদি এটি হয়ে থাকে যে, তাদের ঐশীগ্রন্থে এমন সূক্ষ্ম সত্য বিষয়াদিও রয়েছে যা আয়ত্তকরা কেবল সেরূপ মহান জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের জন্য সম্ভব যাদের জীবন সেসব বিষয়ে চিন্তাভাবনা ও প্রণিধানের মাঝে অতিবাহিত হয়েছে। আর তাতে এমন সব সত্যও রয়েছে যার অতল ও গভীরে কেবল তারাই অবগাহন করতে পারে যারা অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং যারা চিন্তা ও জ্ঞানে গভীরতা রাখে– তাহলে এ উত্তরের মাধ্যমে একান্তভাবে আমাদের কথাই সত্য প্রমাণিত হয়। কেননা একজন নিরক্ষর ও অশিক্ষিত ব্যক্তি যদি এসব সূক্ষ্ম-সত্য বিষয়াদি স্বীয় গ্রন্থাবলী হতে বর্ণনা করে যা তাঁর দাবী অনুসারে সাধারণ জ্ঞানী মানুষ বর্ণনা করতে অক্ষম, তা কেবল বিশেষ লোকদের কাজ– এক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি যদি নিরক্ষর প্রমাণিত হয়, তাহলে সেই নিরক্ষরের কথা নিঃসন্দেহে অদৃশ্য বিষয়াদীর অন্তর্ভুক্ত হবে– এটিই তৃতীয় উপমার অর্থ।

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

জুমুআর খুতবা

মহান আল্লাহ্ তা'লা প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেন

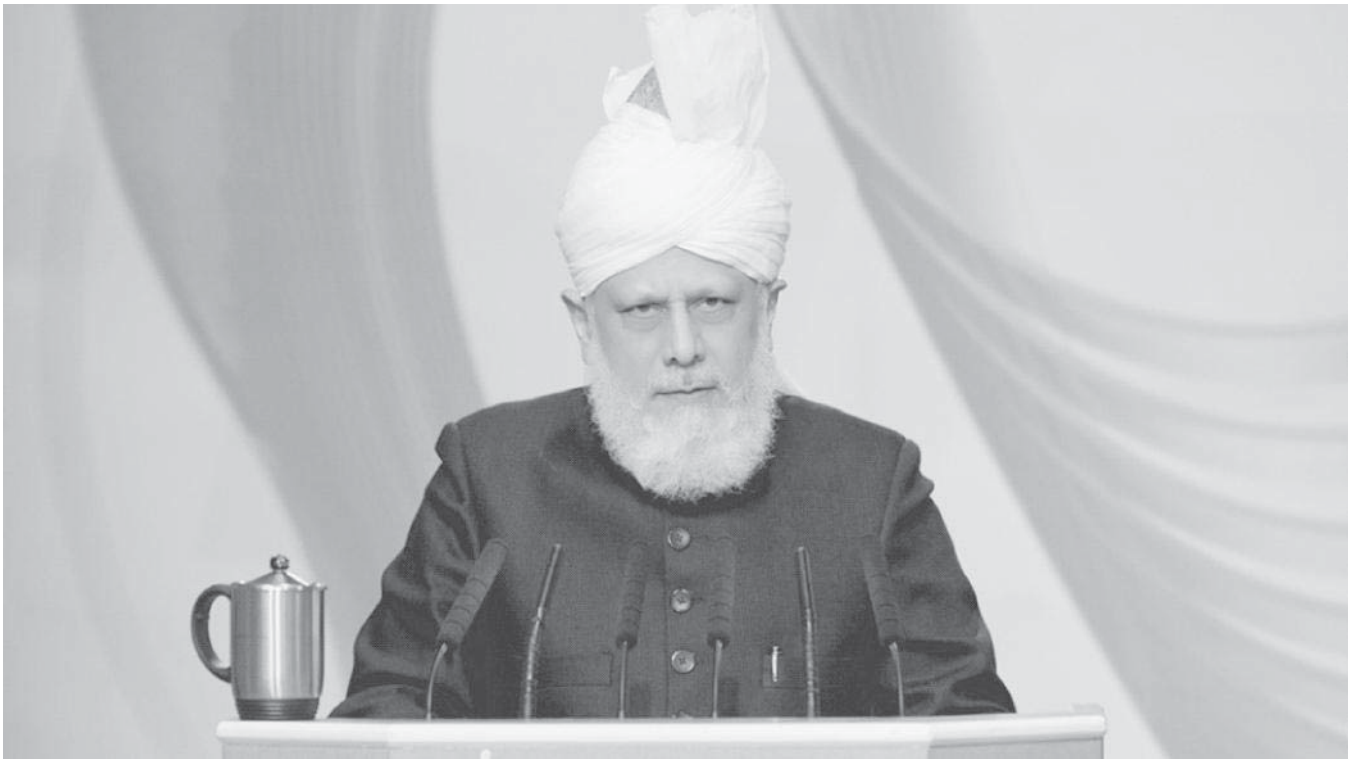

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৭ জুন, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআন থেকে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ ۖ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ۝

(সূরা আল্-বাকারা: ১৮৭)

অর্থাৎ, 'আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন (বল), 'নিশ্চয় আমি (তাদের) নিকটেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। অতএব তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথ পায়।'

এই আয়াতটি রোযা রাখার নির্দেশ, রোযার শর্তাবলী ও রোযা সংক্রান্ত শিক্ষামালার সাথে সম্পর্কযুক্ত আয়াতগুলোর মাঝে অন্তর্ভুক্ত করে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে রমযান এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার মাঝে যে বিশেষ নিবিড় সম্পর্ক আছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, 'রোযা যেভাবে তাক্বওয়া শেখার মাধ্যম অনুরূপভাবে এটি খোদার নৈকট্য লাভেরও একটি মাধ্যম।'

সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত রমযান থেকে তাক্বওয়া বা খোদাভীতি শেখা, তাক্বওয়ার মাঝে জীবন অতিবাহিত করা এবং রমযানকে খোদার নৈকট্য লাভের মাধ্যম

হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা না করা হবে ততক্ষণ রমযান মাস দোয়া গৃহীত হওয়ার মাধ্যম হতে পারে না। আর এটি যদি হয় তাহলে রমযানে খোদার সাথে সৃষ্ট সম্পর্ক শুধু রমযানের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং এক স্থায়ী পরিবর্তনের লক্ষণাবলী মানব জীবনে প্রকাশ পাবে। আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে একথাই বলেছেন, আমি সন্নিকটে, আমি কাছে আছি।

মহানবী (সা.) বলেছেন, 'এ মাসে শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করে দেয়া হয় আর আল্লাহ্ তা'লা কাছে এসে যান, আল্লাহ্ তা'লা নিচের আকাশে নেমে আসেন।' কিন্তু কাদের কাছে আসেন? তাদের কাছে আসেন যারা খোদার নৈকট্য অনুভব করে বা করার ইচ্ছা রাখে। আর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আল্লাহ্‌র তা'লার কথা মেনে চলে। 'ফাল ইয়াসতাজিবুলী' খোদার যে নির্দেশ রয়েছে এর ওপর আমলের চেষ্টা করে। খোদার নির্দেশাবলী খুঁজে বের করে আর সেগুলোর ওপর আমল করার এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করে। আর এ কথার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস এবং ঈমান রাখে যে, খোদা তা'লা সর্ব শক্তির আধার। তাঁর নির্দেশাবলী শিরোধার্য করে একনিষ্ঠভাবে আমি যদি তাঁর কাছে প্রার্থনা করি তাহলে তিনি আমার দোয়া গ্রহণ করবেন।

সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, খোদা তা'লা নিঃসন্দেহে তাঁর বান্দাদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আমি অতি নিকটে, আমি আমার বান্দাদের দোয়া গ্রহণ করি, আর বিশেষ করে এ মাসে তোমাদের কাছে চলে এসেছি, আমাকে ডাক, কিন্তু দোয়া কবুল হওয়ার জন্য আমাকে ডাকার পূর্বে সেসব শর্ত মেনে চলতে হবে অর্থাৎ আমার কথা শোন, গ্রহণ কর, আমার নির্দেশাবলী মেনে চল,এগুলো হল শর্ত। আর আমার সব শক্তি ও ক্ষমতার ওপর দৃঢ় এবং পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর।

অতএব যারা বলে, আমরা দোয়া করি কিন্তু দোয়া গৃহীত হয় না, তারা আত্মবিশ্লেষণ করে দেখেছেকি? বা কখনও আত্মজিজ্ঞাসা করেছে কি যে, খোদার নির্দেশ কতটা মেনে চলছে? যদি আমাদের কর্ম না থাকে, আমল না থাকে, যদি আমাদের ঈমান প্রথাসর্বস্ব হয় তাহলে আমাদের একথা বলা ভুল হবে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লাকে ডেকেছি কিন্তু আমাদের দোয়া গৃহীত হয় নি। খোদা তা'লা কী শর্ত নির্ধারণ করেছেন এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা প্রথম কথা যা বলেছেন তাহল, মানুষের হৃদয়ে তাক্বওয়া এবং খোদাভীতির এমন অবস্থা সৃষ্টি হওয়া চাই যার ফলে আমি তাদের কথা শুনতে এবং গ্রহণ করতে পারি। যদি তাক্বওয়া থাকে, খোদার ভয় থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা দোয়া শুনেন এবংডাকে সাড়া দেন। দ্বিতীয় কথা হল,তারা যেন আমার প্রতি ঈমান আনে, কেমন ঈমান? এ কথার ওপর ঈমান আনতে হবে যে, খোদা আছেন এবং তিনি সব শক্তি ও ক্ষমতার আধার। আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র সত্তা এবং তিনি যে সকল ক্ষমতা রাখেন এর অভিজ্ঞতা মানুষের হোক বা না হোক অথবা সে সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হোক বা না হোক, ঈমান এমন হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ আছেন এবং তাঁর মাঝে সকল শক্তি রয়েছে। অর্থাৎ অদৃশ্য খোদায়, অদৃশ্য সত্তায় পূর্ণ ঈমান থাকতে হবে। এমনটি হলে খোদার পক্ষ থেকে এমন তত্ত্বজ্ঞানও লাভ হবে যার কল্যাণে খোদার পবিত্র সত্তা এবং তিনি যে সব ক্ষমতা বা শক্তির আধার আর তিনি যে দোয়ার উত্তর দেন এই সম্পর্কেও মানুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। প্রথমে মানুষের নিজের ঈমানকে সুদৃঢ় করতে হবে তারপর আল্লাহ্ তা'লা অগ্রসর হবেন এবং প্রমাণও পাওয়া যাবে।

দোয়া গৃহীত হওয়ার শর্তাবলী, এর নীতিএবং দর্শন ইত্যাদি সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিভিন্ন স্থানে বিশদভাবে আলোকপাত করেছেন।

এখন আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কয়েকটি উদ্বৃতি উপস্থাপন করব যার মাধ্যমে আমরা এ বিষয়ের গভীরতা অনুধাবন করে একে রমযানে খোদার নৈকট্যের মাধ্যম হিসেবে নিয়ে নিজেরা জ্ঞান এবং অন্তঃদৃষ্টিতে সমৃদ্ধ হতে পারি আর প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি এবং রমযানের সত্যিকার কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারি।

কেউ কেউ মনে করে, আমরা যে দোয়াই করি তা অবশ্যই গৃহীত হতে হবে বা গৃহীত হওয়া উচিত। এ সম্পর্কে কিছুটা ব্যাখ্যা আমি পূর্বেই করেছি, আল্লাহ্ তা'লা দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য কিছু শর্ত নির্ধারণ করেছেন। সেই শর্ত পূরণ করাও আমাদের জন্য আবশ্যক। দোয়া গৃহীত হওয়ার নীতি কী কী, আর অনেক সময় যারা সব শর্ত দৃষ্টিতে রেখে দোয়া করে তাদের দোয়াও সেভাবে গৃহীত হয় না যেভাবে তারা দোয়া করে থাকে। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, দোয়ার নীতি হল দোয়া গ্রহণেরক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ধারণা এবং কামনা-বাসনার অধীনস্ত নন। দেখ! সন্তান মায়ের কাছে কতই না প্রিয় হয়ে থাকে? তিনি চান তাদের যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়।

কিন্তু সন্তান যদি অনর্থক জোর দিতে থাকে আর কেঁদে কেঁদে যদি ধারালো ছুরি বা জলন্ত কয়লা হাতে নিতে চায় তাহলে মা সত্যিকার ভালোবাসা এবং প্রকৃত আন্তরিকতা সত্ত্বেও কখনো কি চাইবেন যে, তার সন্তান জ্বলন্ত কয়লা নিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলুক বা ছুরির তীক্ষ্ণ ধারালো প্রান্তে হাত মেরে হাত কেটে ফেলুক, মোটেই নয়। একই নীতির ভিত্তিতে দোয়া গৃহীত হওয়ার নীতিটিও বোঝা যায়।

তিনি (আ.) বলেন, এই বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে। দোয়ার ক্ষতিকরকোন দিক থাকলে সেই দোয়া আদৌ গৃহীত হয় না। এ কথা ভালোভাবে বোধগম্য হওয়া সম্ভব যে, আমাদের জ্ঞান সুনিশ্চিত এবং সঠিক নয়, অনেক কাজ আমরা খুবই আনন্দের সাথে কল্যাণময় মনে করি আরধরে নেই, এটিই কল্যাণময় বা আশিসময় হবে কিন্তু পরিণামে তা একটি দুঃখ এবং সমস্যা হিসেবে আমাদের জীবনের অংশ হয়ে যায়। এক কথায় সকল কামনা বাসনা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে, তা যথাযথ এবং সঠিক, কেননা ভুল করা মানুষের বৈশিষ্ট্য। ভুল-ভ্রান্তি মানুষের হয়েই থাকে, এটি তার প্রকৃতির অংশ। তাই 'হওয়া উচিত এবং হয়' মর্মে কিছু কামনা বাসনা বা চাওয়া পাওয়া ক্ষতিকর হয়ে থাকে। আল্লাহ্ যদি এটিকে

সেভাবেই গ্রহণ করে নেন যেভাবে দোয়া করা হয় তাহলে তা খোদার রহমতের যে মর্যাদা রয়েছে তার স্পষ্ট পরিপন্থী কাজ হবে।

মানুষ মনে করে, এমনটি হওয়া উচিত, এভাবে দোয়া গৃহীত হওয়া উচিত। কিন্তু মানুষের নিজের বাসনাইঅনেক সময় নিজের জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে। খোদা যদি তা গ্রহণ করেন তাহলে খোদার রহমতের যে বৈশিষ্ট্য আছে এটি তার বিরুদ্ধে যাবে। খোদা প্রার্থনাকারীর জন্য এবং বান্দার জন্য আশীর্বাদ বা রহমত চান। সে যেভাবে দোয়া করে তিনি যদি প্রত্যেকটি বাসনা সেভাবেই পূর্ণ করেন তাহলে তাঁর রহমত বা দয়া প্রদর্শনের যে মর্যাদা আছে এটি তার পরিপন্থী হবে। এটি নিশ্চিত কথা, খোদা বান্দাদের দোয়া শুনেন এবং গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দেন। কিন্তু সব দোয়া নয় কেননা; আবেগের আতিশয্যে মানুষ অনেক সময় পরিণামের প্রতি দৃষ্টি রাখে না আর দোয়া করে কিন্তু খোদা তা'লা, যিনি সত্যিকার হিতৈষী, সত্যিকার পরিণামদর্শী, তিনি সেসব ক্ষতিকর দিক এবং অশুভ ফলাফলকে সামনে রেখে যা দোয়া গৃহীত হলে দোয়াকারীর হতে পারে, তা প্রত্যাখ্যান করেন। পরিণামের ও প্রতিমানুষের দৃষ্টি থাকে না কিন্তু খোদা, যিনি বান্দার সত্যিকার মঙ্গল চান, তিনি পরিণাম এবং পরিণতি কি হতে যাচ্ছে তাও জানেন। এই দোয়া গৃহীত হলে, এই দোয়ার যে ক্ষতিকর দিকগুলো রয়েছে সেই কারণে তার যে ক্ষতি হতে পারে বা যে কুফল সামনে আসতে পারেএর সবক'টি দৃষ্টিতে রেখে দোয়া প্রত্যাখ্যান করেন।

কেননা আল্লাহ্ তা'লা মনে করেন, এই দোয়া প্রত্যাখ্যানের মাঝেই বান্দার কল্যাণ নিহিত। এই দোয়া প্রত্যাখ্যাত হওয়াই তার জন্য দোয়া গৃহীত হওয়া বৈ-কী। আল্লাহ্‌র সন্নিধানে এমন দোয়া যদি গৃহীত না হয় এবং প্রত্যাখ্যাত হয় তাহলে এটিই দোয়া গৃহীত হওয়া কেননা; আল্লাহ্ তা'লা জানেন, এটি এরজন্য কল্যাণকর নয়। সুতরাং এমন দোয়া যার ফলে মানুষ দুর্ঘটনা এবং সমস্যায় জর্জরিত হতে পারে তা প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করেন অর্থাৎ ক্ষতিকর দোয়ার তিনি দোয়া গ্রহণ করেন না। যা কল্যাণকর তা আল্লাহ্ তা'লা হুবহু গ্রহণ করেন কিন্তু যাতে বান্দার ক্ষতির দিক থেকে থাকে তা প্রত্যাখ্যান করেন, গ্রহণ করেন না, আর এটিই সেই দোয়াগৃহীত হওয়াবা কবুল হওয়া।

তিনি (আ.) বলেন, আমার প্রতি বারংবার এই ইলহাম হয়েছে যে, 'উজীবু কুল্লা দুআইকা'। অন্য ভাষায় এভাবে বলা যায় যে, প্রত্যেক এমন দোয়া যা কল্যাণকর এবং উপকারিতা গ্রহণ করা হবে, সব দোয়া গ্রহণ করা হবে না। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ওলী এবং নবীদেরও কিছু দোয়া শোনেন আর কিছু দোয়া গ্রহণ করেন না আর না করার কারণ হল, তিনি জানেন, এটি কল্যাণকর হবে না বা এর ফলাফল ভয়াবহ হতে পারে কেননা; খোদা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন, আর তিনিই ভালো জানেন।

পুনরায় দোয়ার জন্য নিজের বিশ্বাস এবং কর্মের ওপরও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, এ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, একথা সত্য, যে ব্যক্তি কর্ম এবং শ্রম বিমুখ সে দোয়া করে না। দোয়ার সাথে কর্মও আবশ্যক কেবল দোয়া নয়। এমন ব্যক্তি দোয়া নয় বরং আল্লাহ্‌কে পরীক্ষা করে। যদি কাজের বেলায় ঠনঠন হয় অর্থাৎ আমল না করেশুধু দোয়া করে তাহলে এমন ব্যক্তি দোয়া নয় বরং আল্লাহ্‌কে পরীক্ষা করছে। তাই দোয়ার পূর্বে নিজের সব শক্তিকে কাজে নিয়োজিত করতে হবে আর এটিই দোয়ার অর্থ। প্রথমে নিজের বিশ্বাস এবং কর্মের ওপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখা মানুষের জন্য আবশ্যক কেননা, উপকরণের ভিত্তিতে অবস্থার সংশোধনই হল আল্লাহ্‌র রীতি, সংশোধনের জন্য উপকরণ চাই। তিনি এমন কোন উপকরণ সৃষ্টি করেন যা সংশোধনের কারণ হয়ে থাকে।

যারা বলে, দোয়া করা হলে আর উপকরণের প্রয়োজন কী? বা দোয়া করলে উপকরণের দরকার কী? তাদের এই বিষয়টি নিয়ে ভাবা উচিত। যারা এমন কথা বলে তারা নির্বোধ,তাদের চিন্তা করা উচিত, দোয়া নিজেও তো একটি উপকরণ, এটিও কাজের জন্য একটি মাধ্যম বা কারণ হয়ে থাকে যা অন্য উপকরণ সৃষ্টি করে এবং কোন কাজ সমাধার কারণ হয়। দোয়া নিজেও প্রধানতঃএকটি মাধ্যম এবং কাজ হওয়ার উপকরণ। আর দোয়া গৃহীত হলে সেই কাজের জন্য অন্য উপকরণও সৃষ্টি হয়। কোন মানুষের হয়তো ঋণ বা টাকা পয়সা বা কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় আর আল্লাহ্ তা'লা কোনভাবে, কোন মাধ্যমে তার জন্য কোন উপকরণ সৃষ্টি করে তার জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করেন। আকাশ থেকে বৃষ্টির মতকোন কিছু বর্ষিত হয় না। কারও যদি টাকা পয়সার প্রয়োজন হয় তাহলেতা আকাশ থেকে আসবে না বরং কোন মাধ্যম সৃষ্টি হবে আর সেটিই সেই উপকরণ যা দোয়ার ফলে আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করেন।

তিনি (আ.) বলেন, আর 'ইয়্যাকানাবুদ'কে যে 'ইয়্যা কানাস্তাইন'-এর পূর্বে রাখা হয়েছে যা একটি দোয়া সূচক বাক্য, এটি এই বিষয়টিকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করছে।প্রথমে 'ইয়্যাকানাবুদ' বলা হয়েছে অর্থাৎ আমরা তোমার কাছে সাহায্য চাই। অর্থাৎ আমরা দোয়া করি এবং একই সাথে সাহায্য প্রার্থনা করি। আর সাহায্যের দোয়ার কারণে উপকরণের প্রতিও আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। অতএব আমরা খোদার রীতি এমনটিই দেখছি যে, তিনি উপকরণ সৃষ্টি করেন। দেখ! পিপাসা নিবারণের জন্য পানি, ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাবার সৃষ্টি করেন কিন্তু কোন না কোন উপকরণের মাধ্যমে। সুতরাং উপকরণের বিধান এভাবেই কাজ করছে। আর উপকরণ অবশ্যই সৃষ্টি হয়। কেননা খোদা তা'লার নাম দু'টোই অর্থাৎ 'ওয়া কানাল্লাহু আযিযান হাকিমা' (সূরা আল্-ফাতাহ্: ০৮) আযীয শব্দের অর্থ হল, সব কাজ করা, অর্থাৎ তিনি প্রবল পরাক্রম, শক্তি এবং ক্ষমতার অধিকারী, সব কাজ করতে পারেন আর করেন। আর হাকীম অর্থ হল, প্রতিটি কাজ কোন প্রজ্ঞার অধীনে স্থান এবং স্থান-কালভেদে করা। দেখ! তিনি উদ্ভিদ এবং জড় বস্তুতে বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। জামাল গোটাকে দেখ! তা দু'এক তোলা খেলেই

দাস্ত হয়। অনুরূপভাবে 'ঝপধসসড়হুরও একই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কোন উপকরণ ছাড়াই দাস্তহবে বা পানি ছাড়া পিপাসা নিবারণ হবে, আল্লাহ্ তা'লা এমনটি করার শক্তি রাখেন কিন্তু প্রকৃতির বিস্ময়াদি সম্পর্কে অবহিত করাও আবশ্যক ছিল কেননা; প্রাকৃতিক বিস্ময়াবলী সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি যত বিস্তৃত হয় ততই মানুষ খোদার গুণাবলী সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁর নৈকট্য লাভের যোগ্যতা অর্জন করে।

আল্লাহ্ তা'লা যেসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন এসবের গুণাবলী এবং বিশেষত্বের জ্ঞান সৃষ্টি করাও আল্লাহ্‌র জন্য আবশ্যক কেননা, এসবই আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্ট। তিনি (আ.) বলেন, এসবের জ্ঞান অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান যতইবাড়তে থাকে ততই খোদার গুণাবলী সম্পর্কে মানুষ অবহিত হয়, এ সংক্রান্ত বুৎপত্তি লাভ হয়। আর এটিই একজন ধার্মিকের কাজ। নাস্তিক নিজের জ্ঞানকেই সবকিছু মনে করে কিন্তু একজন মু'মিন জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে খোদার গুণাবলী ও তাঁর শক্তিমত্তার জ্ঞান অর্জন করে।

এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দোয়ার দর্শন কী তাএক জায়গায় এভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি (আ.) বলেন, দেখ এক শিশুযখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে দুধের জন্য চিৎকার করে আর তখনই সবেগে মাতৃস্তনে দুধ নেমে আসে অথচ বাচ্চা দোয়ার নামও জানে না। কিন্তু এর কারণ কী যে, তার চিৎকার দুধকে আকর্ষণ করে। এটি এমন একটি বিষয় যার অভিজ্ঞতা মোটের ওপর সবার রয়েছে। অনেক সময় দেখা গেছে, মায়েরা নিজেদের বক্ষে দুধ আছে বলে অনুভবও করেন না আর প্রায় সময় দুধ থাকেও না। কিন্তু বাচ্চার ব্যাকুল চিৎকার কানে আসতেই বক্ষে দুধ নেমে আসে, যেন বক্ষে দুধ নামার এবং বাচ্চার এই চিৎকারের এক সম্পর্ক আছে। আমি সত্য সত্যই বলছি, খোদার দরবারে আমাদের আহাজারি এবং চিৎকারও যদি এমন ব্যাকুল হয় তাহলে তা তাঁর কৃপা এবং করুণা সাগরকে তরঙ্গায়িত করে এবং তাকে আকর্ষণ করে।

এরপর মা সন্তানের যে দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন এর ওপর আরো বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। এটিই দোয়ার দর্শন, এর অধীনে চাওয়াই মানুষের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত, আর এমনটি হলেই খোদা তা'লা তাকে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দান করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, চাওয়া মানুষের বৈশিষ্ট্য আর গ্রহণ করা বা কবুল করা খোদা তা'লার বৈশিষ্ট্য। যে এটি বোঝে না এবং স্বীকার করে না সে মিথ্যাবাদী। শিশুর যে দৃষ্টান্ত আমি দিয়েছি তা দোয়ার দর্শনকে ভালভাবে স্পষ্ট করে। রহমানিয়্যত এবং রহিমিয়্যত দু'টো পৃথক বিষয় নয়। যে একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি সন্ধান করে সে তা পেতে পারে না। রহিমিয়্যতের জন্য রহমানিয়্যতকে ছেড়ে দেবেন এটি সম্ভব নয়। রহমানিয়্যত বৈশিষ্ট্যের দাবি হল, আমাদের মাঝে রহিমিয়্যত বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগানোর শক্তি সৃষ্টি করা। আল্লাহ্‌র যে রহিমিয়্যত অর্থাৎ তাঁর কাছে চেয়ে কিছু নেয়ার যে বৈশিষ্ট্যরয়েছে, রহমানিয়্যতই সেই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। যে এমনটি করে না সে এই নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

'ইয়্যাকানাবুদ'-র অর্থ হল, আমরা তোমার ইবাদত করি সেই বাহ্যিক উপায়-উপকরণের ভিত্তিতে যা তুমি দান করেছ। আর এই উপকরণগুলোর একটি হল দোয়া আর অপরটি হল,সেসব জিনিসকে কাজে লাগানো যা আমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। দেখ! জিহ্বা,যা রগ এবং স্নায়ুর সমন্বয়ে গঠিত এতে লালা রয়েছে। যদি এমনটি না হত তাহলে আমরা কথা বলতে পারতাম না। জিহ্বা যদি শুকিয়ে যায় তাহলে মানুষের জন্য কথা বলা সম্ভবপর হয় না। জিহ্বার কোন পেশীতে টান পড়লে তা সেখানেই অকার্যকর হয়ে যায়। অনুরূপভাবে দোয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লা জিহ্বা দিয়েছেন যা হৃদয়ের ধ্যান ধারণা প্রকাশে সহায়ক, মানুষ কথা বলতে পারে। আমরা যদি দোয়ার জন্য জিহ্বাকে কখনো ব্যবহার না করি তাহলে এটি আমাদের দুর্ভাগ্য হবে। অনেক ব্যাধি এমন আছে, জিহ্বা যদি তাতে আক্রান্ত হয় তাহলে নিমিষেই জিহ্বার কর্মশক্তি লোপ পায় এবং মানুষ এক পর্যায়ে বোবা হয়ে যায়।

অতএব এটি কত বড় রহিমিয়্যত বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ যে, তিনি আমাদের জিহ্বা দিয়েছেন। অনুরূপভাবে কানের গঠনে যদি পার্থক্য সৃষ্টি হয় তাহলে কিছুই শোনা সম্ভব হয় না। হৃদয়ের অবস্থাও একই। এতে বিগলন এবং ক্রন্দন আর চিন্তা ভাবনা ও প্রণিধানের যে বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন হৃদয় রোগাক্রান্ত হলে এর প্রায় সবক'টি হারিয়ে যায়। উন্মাদদের দেখ! তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকীভাবে অকেজো হয়ে যায়। এসব খোদা প্রদত্ত নিয়ামতরাজির মূল্যায়ন করা কি আমাদের জন্য আবশ্যক নয়? খোদা তা'লা পরম অনুগ্রহ বশতঃ যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছেন এগুলোকে আমরা যদি অকেজো ছেড়ে দেই তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা কৃতঘ্ন। আমরা খোদার নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ বলে গণ্য হব।

তাই স্মরণ রাখতে হবে, নিজের শক্তি বৃত্তিকে কাজে না লাগিয়ে যদি আমরা দোয়া করি তাহলে সেই দোয়া কোন কাজে আসতে পারে না। খোদা তা'লা যেসব শক্তি দিয়েছেন, সামর্থ্য দিয়েছেন, যোগ্যতা দিয়েছেন,উপকরণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার যে নির্দেশ দিয়েছেন, সেসবকে কাজে নিয়োজিত কর, এরপর দোয়া কর। এছাড়া দোয়া কোন কাজে আসে না। কেননা, খোদার প্রথম দান এবং হেবাকে যেখানে আমরা কাজে লাগাই নি সেখানে অন্যটি থেকেকীভাবে কল্যাণ বা উপকার লাভ হতে পারে। এগুলোও আল্লাহ্‌তা'লারই দান যা তিনি সৃষ্টি করেছেন আর এগুলোকে কাজে লাগানো এবং দোয়া করা তবেই উপকারি বা কল্যাণকর সাব্যস্ত হতে পারে।

প্রকৃতির নিয়মে দোয়া গৃহীত হওয়ার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত আছে, এবিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, বস্তুতঃ প্রকৃতির নিয়মেও আমরা দোয়া গৃহীত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। সকল যুগে আল্লাহ্ তা'লা জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এজন্যই তিনি 'ইহদিনা সিরাতাল মুস্তাকিম, সিরাতাল্লাযিনা আন আমতা আলাইহিম' দোয়া শিখিয়েছেন। এটি খোদার ইচ্ছা এবং নিয়ম, কেউ এটি

পরিবর্তন করতে পারবে না। 'ইহদিনা সিরাতাল মুস্তাকিম' অর্থাৎ আমাদের কর্মকে তুমি পরিপূর্ণতা ও সম্পূর্ণতা দাও, আমাদের কর্মকে পরম মার্গে পৌঁছাও। এই শব্দগুলো সম্পর্কে প্রণিধানে বুঝা যায় যে, বাহ্যত এই আয়াতে বা এর মাধ্যমে দোয়ার নির্দেশ রয়েছে বলে মনে হয়, এখানে বাহ্যত এই ইশারা রয়েছে যে, দোয়া কর। 'সীরাতে মুস্তাকিম' বা সঠিক পথ যাচনা করার শিক্ষা বলে মনে হয়, অর্থাৎ সঠিক পথে চলার বা পরিচালিত হওয়ার দোয়া কর। কিন্তু এর পূর্বে 'ইয়্যাকানাবুদ ওয়া ইয়্যাকানাস্তাঈন' বলছে, এটিকে লুফে নাও বা এ থেকে কল্যাণমন্ডিত হও। সঠিক পথের বিভিন্ন গন্তব্য অতিক্রমের জন্য সঠিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে খোদার কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত। সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্ তা'লা যেই শক্তিবৃত্তি দিয়েছেন সেগুলোকে কাজে নিয়োজিত কর এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য চাও। অতএব বাহ্যিক উপকরণের সাহায্য নেয়া আবশ্যক, যে এটিকে প্রত্যাখ্যান করে সে নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

তিনি (আ.) আরও বলেন,অনেক ব্যাধি এমন আছে, জিহ্বার দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেয়া হয়েছে যে, জিহ্বা যদি সেসব রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে জিহ্বা বিকল হয়ে যায়, এ হলো রহিমিয়্যত। অনুরূপভাবে হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লা আকুতি-মিনতি ও চিন্তা-ভাবনা এবং প্রণিধানের বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। সুতরাং স্মরণ রেখ! যদি এসব শক্তি সামর্থ্যকে অব্যাহতি দিয়ে দোয়া করা হয় তাহলে তা আদৌ উপকারী বা কার্যকর হতে পারে না কেননা; প্রথম দানকে যেখানে সে কাজে লাগায় নি সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি থেকে সে কীভাবে লাভবান হতে পারে। তাই 'ইহ্‌দিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম-এর পূর্বে 'ইয়্যাকানাবুদ' রাখা হয়েছে যা থেকে বুঝা যায়, তোমার পূর্বে প্রদত্ত নিয়ামতরাজিকে আমরা অকেজো ছেড়ে দেই নি বা নষ্ট করিনি। স্মরণ রেখ! রহমানিয়্যতের বৈশিষ্ট্য হল, রহিমিয়্যত থেকে উপকৃত হওয়ার মানুষকে যোগ্য করে তোলা।

আল্লাহ্ তা'লা যে, 'উদউনী আস্তাজিব (সূরা আল্-মু'মিন: ৬১) বলেছেন এটি শুধু শব্দ বা বুলিসর্বস্ব নয় বরং এটি মানুষের মানবীয় সম্মানের দাবি। চাওয়া মানুষের বৈশিষ্ট্য আর বিশেষত্ব। যে দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য চেষ্টা করে না, যে এই চেষ্টায় রত থাকে না যে আল্লাহ তা'লা দোয়া গ্রহণ করুন– সে অন্যায় করে। দোয়া এক আনন্দদায়ক বা তৃপ্তিকর অবস্থার নাম। পরিতাপের বিষয় যে, সে শব্দ কোথায় পাবো যার মাধ্যমে আমি পৃথিবীর মানুষকে এই পরম আনন্দ ও স্বাদ সম্পর্কে বুঝাতে পারব? এটিতো অনুভব করার বিষয়।

সারকথা হল, দোয়ার আবশ্যকীয় উপকরণগুলোর মাঝে প্রধানত যা আবশ্যকীয় তাহল নেক কর্মশীল হওয়া, সেই কর্ম বা সেই কাজ করা যা করার আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন আর নিজের বিশ্বাস এবং ঈমানকে দৃঢ় করা, কেননা যে ব্যক্তি নিজের বিশ্বাসের সংশোধন করে না এবং নেককর্ম বা সৎকর্মের ভিত্তিতে কার্যসাধন করে না কিন্তু দোয়া করে এমন ব্যক্তি যেন আল্লাহ্‌কে পরীক্ষা করছে। আসল কথা হল, 'ইহ্‌দিনা সিরাতাল মুস্তাকিম'-এর দোয়ার উদ্দেশ্য হল, আমাদের আমল এবং কর্মকে তুমি পরিপূর্ণতা দাও, উৎকর্ষতা দান কর। এরপর 'সিরাতাল্লাযিনা আন আমতা আলাইহিম' বলে বিষয়টিকে আরো খোলাসা করেছেন যে, আমরা সেই সঠিক পথের হিদায়াত চাই যা নিয়ামতপ্রাপ্ত শ্রেণীর পথ, আমাদেরকে এমন লোকদের পথ দেখাও যাদের ওপর তুমি নিয়ামত নাযিল করেছ। তিনি (আ.) বলেন, অভিশপ্তদের পথ থেকে তুমি আমাদের রক্ষা কর, যারা অভিশপ্ত হয়েছে তাদের পথে চলা থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর, আমাদের আমল বা কর্ম যেন সবসময় সঠিক থাকে,কোন এমন কাজ যেন না হয় যা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার পরিপন্থী।যাদের ওপর অপকর্মের কারণে খোদার ক্রোধ বর্ষিত হয়েছিল। 'যাল্লিন' বলে এই দোয়া শিখিয়েছেন যে, তোমার সাহায্য এবং সমর্থন আমাদের লাভ হবে না এমন অবস্থা থেকে তুমি আমাদের রক্ষা কর। তোমার রহমানিয়্যত থেকে আমরা লাভাবান হতে পারব না, তোমার রহিমিয়্যত থেকেও বঞ্চিত হবো আর তোমার সাহায্য, তোমার দয়া এবং কৃপা থেকেও আমরা বঞ্চিত হবো আর হাবুডুবু খাবো, এমনটি যেন না হয়। এখানে 'যাল্লিন' বলে আল্লাহ্ তা'লা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লার দরবারে ক্রন্দন এবং আহাজারির ফলে কিছুই লাভ হয় না মর্মে জগতপূজারীদের যে ধারণা রয়েছে তার খণ্ডন করতে গিয়ে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

অনেকের ধারণা হল, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আহাজারি ও ক্রন্দনে কিছুই লাভ হয় না। এমন ধারণা সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত এবং মিথ্যা, এমন মানুষ আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র সত্তা এবং তাঁর শক্তি ও নিয়ন্ত্রণের গুণাবলীতে বিশ্বাস রাখে না। যদি তাদের মাঝে সত্যিকার বিশ্বাস থাকত তাহলে তারা এমনটি বলার ধৃষ্টতা দেখাত না। যখন কোন ব্যক্তি খোদার দরবারে আসে আর সত্যিকার তওবার সাথে সে প্রত্যাবর্তন করে তখন আল্লাহ্ তা'লা সব সময় তার ওপর কৃপাবারি বর্ষণ করেন।

এক ফার্সী কবিতায় কেউ খুবই সত্য বলেছে,

"আশেক কে শুদ কে ইয়ার বাহালশ্
নাযার না কারদ্, এ্যা খাজা দারদ্ নিস্ত
ওগার না তবীব হাস্ত।"

'সে কেমন প্রেমিক যার প্রতি প্রেমাস্পদ তাকায়ই না। হে বান্দা! হে মানুষ! ব্যাথা বা বেদনাই নেই, নতুবা চিকিৎসক তো রয়েছে।' তোমার মাঝে বা তোমার হৃদয়ে ব্যাথা নেই, চিকিৎসক আছেন। নিজের মাঝে ব্যাথা এবং বেদনা সৃষ্টি কর, খোদা তা'লাদোয়া গ্রহণ করেন। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা চান, তোমরা পবিত্র হৃদয় নিয়ে তাঁর দরবারে আস। একমাত্র শর্ত হল, নিজেদেরকে তাঁর নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তন কর। এরপর 'ইয়াস তাজিবুলী' মেনে চল আর সেই পবিত্র সত্যিকার পরিবর্তন যা মানুষকে আল্লাহ্‌র দরবারে যাওয়ার যোগ্য করে তা নিজের মাঝে সৃষ্টি করে দেখাও। আমি তোমাদের সত্য বলছি, আল্লাহ্‌র সত্তায় বিস্ময়কর সব শক্তি রয়েছে। তাঁর মাঝে অনন্ত ফযল এবং কল্যাণরাজি রয়েছে, কিন্তু তা দেখার জন্য ভালোবাসার চোখ সৃষ্টি কর। যদি

সত্যিকার ভালোবাসা থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অনেক বেশি দোয়াগ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌কে এমনভাবে ভালোবাস যেন তিনি দোয়া গ্রহণ করেন, সত্যিকার ভালোবাসা যদি থাকে তাহলে তিনি অনেক বেশি দোয়া গ্রহণ করেন এবং সাহায্য এবংসমর্থনওদান করেন।

আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য মানুষের কেমন হওয়া উচিত, যার কল্যাণে মানুষের দোয়া খোদা শোনেন এবং স্বীয় শক্তি ও কুদরত প্রদর্শন করেন, এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, শর্ত হল আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসা এবং নিষ্ঠা থাকা । আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসা এমন একটি বিষয় যা মানুষের হীন এবং ইতর জীবনকে দগ্ধ করে তাকে নতুন এক স্বচ্ছ ও নিষ্কলুষ মানুষে পরিণত করে। তখন সে এমন সব বিষয় দেখে যা পূর্বে দেখেনি, এমন কিছু শোনে যা পূর্বে শোনেনি, বস্তুত আল্লাহ্ তা'লা কৃপা এবং অনুগ্রহের যে আধ্যাত্মিক আহার্য সৃষ্টি করেছেন তা থেকে সত্যিকার অর্থে লাভবান হওয়ার জন্য তিনি মানুষকে শক্তি এবং সামর্থ্যও দিয়েছেন। তাই এগুলোকে ব্যবহার করা এবং কাজে লাগানো উচিত। যদি শক্তিসামর্থ্য দিয়ে উপকরণ সৃষ্টি না করতেন তাহলে ত্রুটি থেকে যেত। আর যদি এই উপকরণ থাকত আর তা হস্তগত করার শক্তি সামর্থ্য না থাকত তাহলেই বা কি লাভ হতো।

কিন্তু না, বিষয়টি এমন নয়, তিনি শক্তি-সামর্থ্য এবং যোগ্যতাও দিয়েছেন আর উপকরণও সৃষ্টি করেছেন। যেভাবে একদিকে খাদ্যের উপকরণ সৃষ্টি করেছেন সেখানে অপরদিকে চোখ, জিহ্বা এবং দাঁত আর পাকস্থলী দিয়েছেন আর যকৃত ও অন্ত্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। এসব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছেন খাদ্য সামগ্রীকে। যকৃত, পাকস্থলী, অন্ত্র ও পরিপাকতন্ত্র এসব কিছু খাদ্য পরিপাকের জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। যদি পেটে কিছু না যায় তাহলে হৃৎপিন্ডে রক্ত কোথা থেকে আসবে, খাবার প্রক্রিয়াজত হয়ে রক্তের অংশকীভাবে হবে, এরপর আবর্জনা হয়েকীভাবে বের হবে? অনুরূপভাবে সর্বপ্রথম যে কৃপা তিনি করেছেন তাহল, মহানবী (সা.)-কে ইসলামের মত উৎকর্ষ এবং সম্পূর্ণ ধর্মসহ পাঠিয়েছেন। তাঁকে 'খাতামান নবীঈন' বানিয়েছেন। কুরআন শরীফের মত কামেল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ দান করেছেন; এরপর কিয়ামত পর্যন্ত কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ হবে না, কোন নতুন নবী নতুনকোন শরীয়ত নিয়েও আসবে না। এরপর চিন্তা এবং প্রণিধানের যে শক্তি রয়েছে সেগুলোকে যদি ব্যবহার না করি, খোদার দিকে যদি অগ্রসর না হই তাহলে কত বড় আলস্য এবং ঔদাসীন্য এটি। একটু চিন্তা কর, আল্লাহ্ তা'লা প্রথম সূরাতেই কত বিস্তারিতভাবে কৃপাধন্য হওয়ার রীতি শিখিয়েছেন।

অতএব এই হল লাভবান হওয়ার রীতি। মহানবী (সা.)-এর মত নবী আমাদেরকে দিয়েছেন, যেন আমরা তাঁর সুন্নত অনুসরণ করতে পারি। তিনি আমাদেরকে কুরআনের মত গ্রন্থ দিয়েছেন যেন আমরা এই কুরআনের আদেশ নিষেধ মেনে চলতে পারি। তিনি (আ.) বলেন, এই প্রথম সূরাতেই অর্থাৎ সূরা ফাতিহায় কত বিস্তারিতভাবে কৃপাধন্য হওয়ার দোয়া শিখিয়েছেন। এই সূরা, যার নাম হল 'খাতামাল কুতুব' এবং 'উম্মুল কুতুব', মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি তা পরিষ্কারভাবে অবহিত করেছেন এবং তা কীভাবে অর্জন করা যায় তাও বলেছেন। 'ইয়্যাকানাবুদ' মানবপ্রকৃতির মূল দাবি এবং মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আর এটিকে 'ইয়্যাকানাস্তাইন'-এর পূর্বে রেখে বলেছেন, প্রথমে আবশ্যক হল, যতটা সম্ভব মানুষের শক্তি-সামর্থ্য এবং বোধ-বুদ্ধি যা আছে তা ব্যবহার করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা এবং সংগ্রাম করা আর খোদা প্রদত্ত শক্তি-বৃত্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগানো, এরপর খোদার কাছে এর পূর্ণতা, উৎকর্ষতা এবং ফলপ্রদ হওয়ার জন্য দোয়া করা।

খোদাকে চেনার উপায় কী? তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

এটি সত্য কথা যে, 'খুলিকাল ইনসানা জায়িফা' (সূরা আন্-নিসা: ২৯)মানুষ দুর্বল সৃষ্টি, সে খোদার কৃপা এবং বদান্যতা ছাড়া কিছুই করে উঠতে পারে না। খোদার কৃপা না থাকলে কিছুই করা সম্ভব হয় না। তার অস্তিত্ব, তার লালন-পালন, তার স্থায়ীত্বের পুরো উপকরণ নির্ভর করে খোদার কৃপার ওপর। নির্বোধ সে, যে নিজের বোধ-বুদ্ধি বা নিজের সম্পদ নিয়ে গর্ববোধ করে, কেননা এসব কিছু খোদারই দান, সে কোত্থেকে এনেছে এসব? দোয়ার জন্য আবশ্যকীয় বিষয় হল, মানুষের নিজের দুর্বলতা এবং সীমাবদ্ধতাকে দৃষ্টিতে রাখা। নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে সে যতই ভাববে এবং চিন্তা ও প্রণিধান করবে ততই নিজেকে খোদা তা'লার সাহায্যের মুখাপেক্ষী দেখতে পাবে। এভাবে দোয়ার জন্য এক প্রকার আবেগ এবং উচ্ছ্বাস তার মাঝে সৃষ্টি হবে। অনেকে বলে দোয়ার জন্য জোশ এবং আবেগ-উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয় না, তাদের মূলতঃ নিজেদের সীমাবদ্ধতার ওপর দৃষ্টি রাখা উচিত। খোদার প্রতি ভালোবাসার দাবি পূরণের চেষ্টা করলে এক ধরনের জোশ, এক আবেগ, এক উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হবে। মানুষ যখন সমস্যা কবলিত হয়, দুঃখ এবং অসচ্ছলতার মুখোমুখি হয়, প্রচণ্ড চিৎকার করে এবং ডাকে আর অন্যের কাছে সাহায্য চায়, অনুরূপভাবে যদি সে নিজের দুর্বলতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে চিন্তা করে আর প্রতিটি মুহূর্ত যদি নিজেকে খোদার সাহায্যের মুখাপেক্ষী মনে করে তাহলে তার আত্মা আকুল আবেগ এবং ব্যাকুলতার সাথে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সিজদাবনত হবে এবং কাঁদবে, আহাজারি করবে আর 'ইয়া রাব্ব, ইয়া রাব্ব' অর্থাৎ হে আমার প্রভু, হে আমার প্রভু! বলে তাঁকে ডাকবে। গভীর মনোযোগ সহকারে কুরআনের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত কর তাহলে তোমরা জানতে পারবে, প্রথম সূরাতেই আল্লাহ্ তা'লা দোয়া শিখিয়েছেন,

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۧ

তিনি বলেন, দোয়া তখনই সকল বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হতে পারে যদি তা কল্যাণকর হয় এবং স্থান-কাল ভেদে করা হয়। সকল ক্ষতিকর বিষয় থেকে এটি মানুষকে রক্ষা করে। সেটিই দোয়া যা সকল প্রকার কল্যাণে সমৃদ্ধ, যা মানুষের জন্য

কল্যাণকর এবং যা মানুষের জন্য উপকারী। মানুষের জন্য যে ক্ষতিকর দিকগুলো রয়েছে তা থেকে তাকে রক্ষা করার সেসব বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে রাখে ও সেসব বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। সুতরাং 'ইহ্‌দিনা সিরাতাল মুস্তাকিম' থেকে 'যোয়াল্লিন' পর্যন্ত দোয়ায় যত কল্যাণকর দিক থাকতে পারে সম্ভাব্য সকল কল্যাণের দোয়া এতে করা হয়। আর সবচেয়ে ভয়াবহ ক্ষতিকর দিক যা মানুষকে ধ্বংস করে তা থেকে মুক্তি এবং পরিত্রাণের দোয়া এটিই।

সুতরাং আমাদের দৃষ্টিতে রাখতে হবে, সবচেয়ে বড় যেসব দোয়া এই সূরায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা জাগতিক কোন দোয়া নয় বরং ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত দোয়া। তাই নিজেদের ধর্মের হিফাযত এবং সুরক্ষার জন্য দোয়াকে অগ্রগণ্য করা উচিত। দোয়া করলেই খোদার নৈকট্যের দ্বার উন্মোচিত হয় আর এর ফলে বাকী সব দোয়া আপনা-আপনি গৃহীত হয়ে যায়। প্রকৃত দোয়া হল, ধর্মের দৃঢ়তার জন্য দোয়া করা, আর এটিই খোদার নৈকট্য অর্জন এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার কারণ হয়ে থাকে। এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

অর্থাৎ আমি তওবাকারীর তওবা গ্রহণ করি। আল্লাহ্ তা'লার এই প্রতিশ্রুতি সেই অঙ্গীকারকে বৈধ আখ্যা দেয় যা সত্যিকার তওবাকারী করে থাকে। যদি খোদার পক্ষ থেকে এ ধরণের প্রতিশ্রুতি না থাকত তাহলে তওবা গৃহীত হওয়া এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। আন্তরিকভাবে কৃত অঙ্গীকারের ফলে যা হয় তাহল, আল্লাহ্ তা'লাও তাঁর সকল প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন, যা তিনি তওবাকারীদের সাথে করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তার হৃদয়ে এক আলোর প্রতিফলন ঘটতে থাকে যখনমানুষ অঙ্গীকার করে, আমি সকল পাপ এড়িয়ে চলব আর ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিব।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নৈকট্য ও দোয়া গৃহীত হওয়ার যে রীতি উল্লেখ করেছেন এর মাঝে সবচেয়ে উন্নত মাধ্যম হল, নামায। নামাযের অবস্থা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, নামাযের মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হল দোয়া, আর দোয়া করা আল্লাহ্‌র একান্ত প্রকৃতি সম্মত। সচরাচর আমরা দেখে থাকি একটি শিশু যখন ক্রন্দন করে, উৎকণ্ঠা এবং ব্যাকুলতা প্রকাশ করে তখন মা কতটা ব্যাকুল হয়ে তাকে দুধ পান করান। প্রভুত্ব এবং দাসত্বের মাঝে এমনই একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে যা সবার পক্ষেঅনুধাবন করা সম্ভব নয়। মানুষ যখন খোদা তা'লার দরবারে সিজদাবনত হয়ে পরম বিনয়ের সাথে ও আকুতি মিনতির সাথে তাঁর সামনে নিজের পুরো চিত্র তুলে ধরে আর নিজের চাওয়া-পাওয়া তাঁর কাছেই উপস্থাপন করে তখন প্রভুর বদান্যতা অবশ্যই প্রকাশিত হয় আর এমন ব্যক্তির প্রতি করুণা প্রদর্শন করা হয়। খোদার কৃপা এবং বদান্যতার দুগ্ধ এক ক্রন্দনের দাবী রাখে, এক আহাজারির দাবি রাখে। তাই খোদার ফযল এবং বদান্যতার দুগ্ধ যদি পান করতে হয় তাহলে তাঁর দরবারে বিনয় এবং আকুতি-মিনতির সাথে ক্রন্দন করতে হবে। তিনি (আ.) বলেন, এর জন্য ক্রন্দনশীল দৃষ্টি বা চোখের প্রয়োজন।

সুতরাং রমযানে যেখানে অধিকাংশ মানুষের মনোযোগ আল্লাহ্‌র ফযলে মসজিদের প্রতিও নিবদ্ধ, আর বাজামাত নামাযের প্রতিও মনোযোগ রয়েছে, সেই সাথে নফলের প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। এরপর সেসব দোয়া যা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়া এবং খোদার নৈকট্য লাভের জন্য হয়ে থাকে সেগুলোকে আমাদের অগ্রগণ্য করা উচিত। এগুলোই প্রথম দোয়া হওয়া উচিত আর পরে জাগতিক দোয়া আসা উচিত। আমাদের যেসব জাগতিক উদ্দেশ্যে চাওয়া-পাওয়া রয়েছে আল্লাহ্ তা'লা নিজেই তা পূর্ণ করবেন।

এখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি দোয়া উপস্থাপন করব যা এই দিনগুলোতে আমাদের বিশেষ ভাবে করা উচিত, যেন খোদার নৈকট্য লাভ হয়। আল্লাহ্ তা'লার সন্নিধানে তিনি (আ.) দোয়া করেন, হে বিশ্ব প্রতিপালক! তোমার অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই, তুমি পরম দয়ালু এবং বদান্যশীল।আমার প্রতি তোমার অশেষ কৃপা রয়েছে। আমার পাপ ক্ষমা কর, কোথাও যেন আমি ধ্বংস না হয়ে যাই। আমার হৃদয়ে তোমার খাঁটি ভালোবাসা সৃষ্টি কর যেন আমি জীবন লাভ করতে পারি, আমার দুর্বলতা ঢেকে রাখো আর আমাকে এমন কাজের তৌফিক দাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। তোমার মহাসম্মানিত চেহারার দোহাই তুমি আমাকে ক্রোধ থেকে রক্ষা কর, করুণা কর, কৃপা কর, ইহ এবং পরকালের বালা এবং বিপদাবলী থেকে আমাকে রক্ষা কর কেননা; সকল কৃপা এবং বদান্যতা আর অনুগ্রহ তোমারই হাতে। আমীন, সুম্মা আমীন।

আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন দোয়ার প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করতে পারি। এ রমযান আমাদের সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুক এবং স্থায়ীভাবে তার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুক আল্লাহ্‌তে যাদের ঈমানে দৃঢ়, যারা তাঁর নির্দেশাবলীর প্রতি কর্ণপাত করে এবং সেই অনুসারে আমল করে আর নিজেদের প্রতিটি কাজের ওপর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয় ও অগ্রগণ্য করে। আমাদের প্রতিটি কাজ যেন সম্পূর্ণভাবে খোদার সন্তুষ্টি অনুসারে হয়,আমাদের বিশ্বাস যেন পূর্বের চেয়ে বেশি দৃঢ় হয়, আমাদের মাঝে খোদার সত্যিকার ভালোবাসা সৃষ্টি হোক, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ইহ এবং পারলৌকিক সমস্যাবলি থেকে রক্ষা করুন।

নামাযের পর দু'ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা হবে। তাদের একজন হলেন শ্রদ্ধেয় রাজা গালেব আহমদ সাহেব।তিনি জামাতের একজন প্রবীন খাদেম ছিলেন, উর্দূ ভাষার প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত কবি এবং সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি শিক্ষাবীদ এবং শিক্ষা বিশারদ ছিলেন। সরকারী চাকরী করেছেন, পাঞ্জাব টেক্সট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যানও ছিলেন। ২০১৬ সনের ৪ঠা জুন লাহোরে ৮৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি ১৯২৮ সনে গুজরাত শহরে জন্মগ্রহণ করেন, তার পিতা হযরত

রাজা আলী মোহাম্মদ সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। ১৯০৫ সনে তিনি বয়আত করে জামাতভুক্ত হন। তার পিতা কাদিয়ানে নাযের মাল এবং নাযেরে আলা হিসেবে জামাতের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। রাজা গালেব সাহেবের নানা ছিলেন মালেক বরকত আলী সাহেব। হযরত মালেক আব্দুর রহমান খালেদ (যিনি খালেদে আহমদীয়াত ছিলেন) তিনি তার মামা হন।

তিনি লাহোর থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন, কাদিয়ানে উচ্চমাধ্যমিক আর লাহোরের সরকারী কলেজ থেকে সাইকলোজিতে মাষ্টার্স করেন এবং ১ম স্থান অধিকার করেন। কবি, বুদ্ধিজীবি এবং শিক্ষাবিদ আর সাহিত্যের সমালোচক হিসাবে বিশেষ জ্ঞানী এবং সাহিত্যিক শ্রেণীর মাঝে সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। আল ফযলের পাশাপাশি দেশীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়ীকিতে তার রচনাবলী এবং কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হত। পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে চাকরির মাধ্যমে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। এরপর ১৯৬২ সনে পাঞ্জাব শিক্ষা বিভাগে যোগ দেন। এছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন যেমন, জেনারেল সেক্রেটারী এবং কন্ট্রোলার বোর্ড অফ ইন্টারমিডিয়েট, পাঞ্জাব মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের সেক্রেটারী, সারগোধা উচ্চমাধ্যমিক বোর্ডের চেয়ারম্যান, পাঞ্জাব টেক্সট বোর্ডের চেয়ারম্যান, পাঞ্জাব সরকারের শিক্ষা বিভাগীয় উপদেষ্টা হিসাবেও উল্লেখযোগ্য সেবা করেছেন। তার জামাতী সেবার ইতিহাসও অনেক দীর্ঘ। লাহোরে জেনারেল সেক্রেটারী ও সেক্রেটারী তালীম এবং আরো বেশ কিছু পদে খিদমত করেছেন। ১৯৭৪ সালে জামাতে আহমদীয়ার মুখপাত্র হিসাবে বেশ কয়েকবার সংবাদ সম্মেলন করেছেন, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এবং বিবৃতি দেয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

তিনি পত্র-পত্রিকায় চিঠি লিখতেন। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ফজলে ওমর ফাউন্ডেশনের পরিচালক হিসাবে কাজ করেছেন। ডাইরেক্টর ওয়াক্‌ফে জাদীদ ছিলেন ১৯৭৪ থেকে ৮৫ সাল পর্যন্ত, এছাড়া নাসের ফাউন্ডেশনের নায়েব সদর বা ভাইস প্রেসিডেন্টও ছিলেন। খুবইসহজ-সরল এবং শান্ত-শিষ্ট প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। খিলাফতের সাথে সুগভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল, জামাতের কর্মকর্তাদের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার মাগফিরাত করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার নিজের কোন সন্তান ছিল না, এক পালক কন্যা আছে, আল্লাহ্ তা'লা তাকেও ধৈর্য দিন।

দ্বিতীয় জানাযা মুকাররম মালেক মোহাম্মদ আহমদ সাহেবের, তিনি ওয়াকেফে যিন্দেগী ছিলেন, ২০১৬ সনের ৬ই মে ইন্তেকাল করেন। এই উভয় জানাযা গত শুক্রবারে পড়ানোর কথা ছিল কিন্তু কোন কারণে পড়ানো সম্ভব হয়নি। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত শেখ ফযল আহমদ সাহেব বাটালভী (রা.)-এর বড় পুত্র ছিলেন। খলীফাদের এবং খিলাফত ব্যবস্থার সাথে আনুগত্য, আবেগ এবং ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতেন। সন্তানদেরও এই বৈশিষ্ট্যের ধারক-বাহক হওয়ার নসীহত করতেন। জামাতের ব্যবস্থাপনার প্রতি অনুগত, ভদ্র, মিশুক, বিনয়ী, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সহমর্মী, স্নেহশীল, সহানুভূতিশীল এবং নেক মানুষ ছিলেন। সারা জীবন বেশ কিছু মানুষের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেছেন, অনেক ছেলেমেয়ের পড়াশুনার দায়িত্ব বহন করেছেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই দায়িত্বগুলো তিনি খুব সুন্দরভাবে পালন করেছেন। তাহরীকে জাদীদের দপ্তর আউয়ালের পাঁচ হাজার মুজাহিদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মসজিদ নির্মাণ এবং অন্যান্য তাহরীকে অংশ নেয়ার ক্ষেত্রেও উদার মনোভাবের পরিচয় দিতেন। রাবওয়ায় একটি ভূমিখণ্ডও তিনি জামাতের হাতে তুলে দিয়েছেন।

১৯৪৫ সালের ২০শে অক্টোবরে তিনি ধর্মের খাতিরে জীবন উৎসর্গ করেন। প্রথমে তিনি বাইরে চাকরী বা কাজ করতেন, এরপর জীবন উৎসর্গ করেন। রাবওয়ায় নির্মাণ বিভাগে ১৯৪৯ থেকে ৫৫ সাল পর্যন্ত খিদমত করেছেন, ৫৫ থেকে ৬৮ সাল পর্যন্ত ওকালত তবশীর বিভাগে সুপারিনটেনডেন্ট বা অধীক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন। ১৯৬৯ থেকে ৮২ পর্যন্ত নায়েব অফিসার আমানত হিসাবে খিদমত করার সুযোগ পেয়েছেন। ৮২ থেকে ৮৬ পর্যন্ত নায়েব উকিলুল মাল সানী হিসাবে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। ৮৫ তে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৮৯ এর জুন পর্যন্ত পুনরায় নিযুক্ত হয়ে জামাতের খিদমত বা সেবা করা অব্যাহত রাখেন। ৮৬ থেকে ৮৯ পর্যন্ত নায়েব উকিল তা'মিল ও তানফিয হিসেবে কাজ করেন। প্রায় ৪৭ বছর জামাতের খিদমতের সুযোগ পেয়েছেন। এরপর তিনি নিজ সন্তানের কাছে জার্মানী স্থানান্তরিত হয়। খুবই ইবাদতগুযার ও কুরআন তিলাওয়াতকারী ছিলেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলীর অধ্যায়ন ছিল ব্যাপক। আল্লাহ্‌র ফযলে মুসী ছিলেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে ২ পুত্র এবং ৪ কন্যা রেখে গেছেন। আমাদের জামাতের মুবাল্লিগ লেইক তাহের সাহেব তার ছোট ভাই, এখানে আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনালেও ওয়াকেফে যিন্দেগী কর্মী মালেক মাহমুদ সাহেব তার ছোট সন্তান। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত করুন এবং তাকে কৃপাধন্য করুন, তার সন্তান-সন্ততি এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে জামাত এবং খিলাফতের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালা-এ-আওহাম

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(২৩তম কিস্তি)

মোটকথা, হে ভ্রাতাগণ! এ হাদীসসমূহে দৃষ্টিপাতে প্রত্যেকেই বুঝতে পারেন যে, ইসলামের প্রারম্ভিককালে মানুষ (তথা সাহাবা কিরাম) প্রতিশ্রুত দাজ্জাল সম্পর্কে কখনও এ মর্মে সর্বসম্মত অভিমত পোষণ করেন নি যে দাজ্জাল শেষ যুগে বের হবে এবং হযরত মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম আবির্ভূত হয়ে তাকে হত্যা করবেন। বরং তাঁরাতো (ইহুদী বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তি) ইব্‌নে-সাইয়াদকেই চিহ্নিত দাজ্জাল বলে বিশ্বাস করেছিলেন।

এরপর নিজেদের জীবদ্দশায় তাঁরা এ-ও প্রত্যক্ষ করলেন যে, সে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। এরপর সে মদীনা-মুনোওয়ারায় মারা গেলে মুসলমানগণ তার জানাযার নামায আদায় করেছেন। এরপরও এমতাবস্থায় কী করে সকল বুযুর্গ সাহাবার এ বিষয়ে ঈমান ও বিশ্বাস (সৃষ্টি) হতে পারতো যে, মসীহ্ - ইবনে-মরিয়ম শেষ যুগে চিহ্নিত দাজ্জালকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন? কেননা এ সকল বুযুর্গ তো পূর্বাহ্নেই চিহ্নিত দাজ্জাল (ইবনে-সাইয়াদ)-এর মৃত্যুবরণ স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এর ওপরও ঐ বিশ্বাসের সঙ্গে কী ক'রে এ বিশ্বাসটি যুক্ত হতে পারে যে তাঁরা প্রতীক্ষায় ছিলেন, হযরত মসীহ্ (আ.) আকাশ থেকে নেমে এসে চিহ্নিত দাজ্জালকে বধ করবেন?! এটাতো প্রকাশ্যভাবে দু'টি স্ব-বিরোধী বিষয়ের একত্রিত হওয়ার নামান্তর। কোনো বুদ্ধিমান ও প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি এরকম দু'টি পরস্পর বিরোধী বিশ্বাস ধারণ করতে পারে না। এখন ভেবে দেখা উচিত, আখেরী যুগে প্রতিশ্রুত দাজ্জাল ও মসীহ্-ইবনে-মরিয়মের (যুগপথ) আবির্ভাব হবে বলে সাহাবা-কিরামের সর্বসম্মত অভিমত ছিল– এ বর্ণনাটি যে এ বুযুর্গদের ওপর কতো ভিত্তিহীন অপবাদ! তারপর এ-ও চিন্তা করা উচিত, 'সকল নবী নিজ নিজ উম্মতকে দাজ্জালের বহির্প্রকাশ সম্পর্কে সতর্ক করে এসেছেন এবং আমিও তোমাদের সবাইকে সতর্ক করছি যে দাজ্জাল শেষ যুগে বের হবে'–এ কথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, এটি যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে উচিল ছিল এই বার্তাটি সাহাবা-কিরাম নিজেদের ওপর নির্ধারিত 'তবলীগ' তথা বার্তা পৌঁছানোর একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য মনে করে তা 'তাবেয়ীন'-এর কাছে পৌঁছে দিতেন। ফলে আজ সহাস্রাধিক সাহাবার বর্ণনা সূত্রে এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে মওজুদ হতো।

অথচ নোওয়াস-বিনসামা'আন এবং আরও দু'একজন ছাড়া অন্য কেউ এ হাদীসটি বর্ণনা করেন নি। বরং এটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে নোওয়াস-বিন-সাম'আন কেবল একজনই বটে। অতএব ভেবে দেখুন, একদিকে তো বলা হয় যে, এ হাদীসটির সম্পর্কে সাধারণভাবে সকল সাহাবাকে তাকিদ করা হয়েছিল, 'তোমরা সবাই এ বিষয়টি তাবেয়ীন পর্যন্ত পৌঁছে দিও।' আর অন্যদিকে আমরা যখন দৃষ্টিপাত করি তখন দু'একজন ছাড়া আর কাউকে তা পৌঁছাতে দেখা যায় না। এমতাবস্থায় যে-পরিমাণ দুর্বলতা এ হাদীসটির ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় তা গবেষকদের দৃষ্টি থেকে আদৌ গোপন নয়। তথাপি এ হাদীসটির সম্পর্কে 'তাওয়াতর' তথা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ব্যাপকভাবে বর্ণিত বলে দাবী করা চরম কট্টরতা বৈ আর কী হতে পারে?!

অতএব হে মহোদয়গণ! আপনারা খোদাকে ভয় করুন এবং সাহাবায়ে-কিরাম ও তাবেয়ীনের ওপর এমর্মে মিথ্যারোপ করবেন না যে তাদের সবার এ বিষয়ে 'ইজমা' তথা সর্বসম্মত অভিমত ছিল যে মসীহ্-ইবনে- মরিয়ম আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন এবং বিশ্বজুড়ে খোদাসুলভ (তথা ঐশ্বরিক) কর্মকান্ডের লীলা-খেলা প্রদর্শনকারী এক চোখ বিশিষ্ট (কানা) দাজ্জালকে বধ করবেন। এ বিশ্বাস সম্পর্কে বস্তুতপক্ষে এ বুযূর্গ ও মহৎ ব্যক্তিদের তো খবরই ছিল না। তাঁরা যদি এ সম্পর্কে জ্ঞাত হতেন এবং কোনো কোনো বর্ণনায় যেমন লেখা আছে সে-অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তাঁদের 'ওসীয়্যত' তথা তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়ে থাকতেন তাহলে এটা কি সম্ভব ছিল যে সাহাবা-কিরাম তা পালন করতেন না এবং তাবেয়ীন ও

তাবা'তাবেয়ীনের কাছে বার্তা পৌঁছানোর অবশ্যপালনীয় এ কর্তব্যটি সম্পাদন করতেন না?! মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 'ওসীয়্যত' (তকিদপূর্ণ নির্দেশ) পালন না করা তো স্পষ্টত অবাধ্যতার শামিল। কাজেই এমন অবাধ্যতামূলক অপরাধ প্রধান সাহাবা-কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম কর্তৃক কী করে সংঘটিত হতে পারতো? অতএব স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে এই বার্তা পৌঁছানোর সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে কোনো তাকিদ করা হয়নি। প্রধান সাহাবা-কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-ও এ বার্তা তাবেয়ীনের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে সার্বিক উদ্দীপনায় মনোযোগী হন নি।

আর এ হাদীসের বিষয়বস্তুও এমন বিরল ও স্বল্পখ্যাতিসম্পন্ন সাব্যস্ত হয় যে ইমাম বোখারীর মতো 'রাঈসুল-মুহাদ্দিসীন' (সর্বপ্রধান হাদীসবিদ) উক্ত হাদীসটির দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি। এ হাদীসটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম দামেস্কের পূর্বদিকে মিনারার কাছে অবতীর্ণ হবেন এবং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক বিশ্বজুড়ে যে-সব কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়ে চলেছে তা সবই দাজ্জাল সম্পাদন করে দেখাবে। এখন খেয়াল করা উচিত, এ হাদীসে বর্ণিত বিষয়বস্তুর (আক্ষরিক অর্থের) ওপর সকলের 'ইজ্‌মা' (সর্বসম্মত অভিমত) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে দাবী করা এবং একথা বলা যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত উক্ত বিষয়ে ইসলামের সকল বুযূর্গ ও প্রধানগণের সর্বসম্মত ভাবে ঐক্যমত রয়েছে–এটা যে কতো বড় সত্যের অপলাপ ও বানানো মিথ্যা! বরং এ হাদীসটি তো ঐ সব 'মুতাওয়াতির' তথা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারাই নস্যাৎ ও মৃতবৎ হয়ে দাঁড়ায় যে-গুলো সর্বজনগ্রাহ্য পরম নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন সাহাবীদের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং এতে করে দাজ্জাল সম্পর্কে ফয়সালা করে দেয়া হয়েছে যে সে প্রকৃতপক্ষেই ইবনে-সাইয়্যাদই ছিল এবং সে ইয়াজিদের রাজত্বকালে মদীনা-মুনোওয়ারায় মারা যায় এবং তার জানাযার নামায পড়া হয়।

এটি এক বিস্ময়কর ব্যাপার যে কুরআন মজীদ তো উচ্চৈস্বরে মসীহ্-ইবনে-মরিয়মের ওফাত-প্রাপ্ত হওয়া তথা মারা যাওয়ার সংবাদ দিচ্ছে এবং মুসলিম ও বুখারীর সহীহ্ হাদীসসমূহ একচ্ছত্রভাবে বর্ণনা করছে যে বস্তুতঃ ইবনে-সাইয়াদই চিহ্নিত দাজ্জাল ছিল। হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর মতো বুযুর্গ সাহাবী হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সম্মুখে কসম খেয়ে বলছেন, 'প্রতিশ্রুত দাজ্জাল ইবনে-সাইয়াদই বটে।' আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইয়ে ওয়া সাল্লাম নিজেও একথার সত্যায়ন করছেন যে, প্রকৃতপক্ষে ইবন-সাইয়াদই প্রতিশ্রুত দাজ্জাল। সে অবশেষে মুসলমান হয়ে মারা যায় এবং ইসলামে প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় মদীনায় মারা গেলে মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের এ সকল মুসলান ভ্রাতা তাদের উল্লিখিত জেদ ও হটকারিতা থেকে নিবৃত্ত হন না।

হে ভ্রাতাগণ! এ বিতর্কিত বিষয়ের দু'টি পা ছিল। একটি তো মসীহ্-ইবনে-মরিয়মের আখেরী যুগে সশরীরে আকাশ থেকে নেমে আসা। এটিকে তো কুরআন মজীদ এবং সেই সাথে কতিপয় পবিত্র হাদীস মসীহ্-ইবনে-মরিয়মের মৃত্যুবরণের সংবাদ দেয়ার মাধ্যমে ভেঙ্গে দিয়েছে। আর অপর পাটিকে সহীহ্ মুসলিম ও সহীহ্ বুখারী উভয় গ্রন্থে প্রধান প্রধান সাহাবী সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বিখন্ডিত করেছে এবং ইবনে-সাইয়াদকে প্রতিশ্রুত দাজ্জাল বলে নির্ধারণ এবং পরিশেষে মুসলমানদের জামা'তভুক্ত করে তার মৃত্যুবরণ সাব্যস্ত করেছে।

অতএব এ বিতর্কের পদযুগল যখন ভঙ্গ হয়েছে তখন তেরো শ' বছর পর এখন আবার এই পদবিহীন মৃতটি কেন এবং কিসের ওপর ভর করে দাঁড়াতে পারে? 'ইত্তাকুল্লাহ্! ইত্তাকুল্লাহ্!' 'ইত্কুল্লাহ্! (অর্থঃ আল্লাহ্‌কে ভয় করুন! আল্লাহ্‌কে ভয় করুন! আল্লাহ্‌কে ভয় করুন! –অনুবাদক)।

আর মসীহ্-ইবনে-মরিয়মের মৃত্যুবরণ সম্পর্কে নিশ্চিৎ ও অকাট্য প্রমাণসমূহ এতো বিপুল পরিমাণে রয়েছে যে এগুলো সবিস্তারে তুলে ধরার জন্য এ সংক্ষিপ্ত পুস্তকে সংকুলান সম্ভব নয়। সর্বাগ্রে কুরআন করীমে গভীর দৃষ্টিপাত করুন। আর একটু চোখ মেলে দেখুন, পবিত্র কুরআন কতো পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে মরিয়ম-পুত্র-ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর সংবাদ দিচ্ছে– যা এতো স্পষ্ট ও অকাট্য যে এখানে কোনো জটিল ব্যাখ্যার কোনো অবকাশ নেই। উদাহরণস্বরূপ, খোদা তা'লা কুরআন করীমে ঈসার কথা উদ্ধৃত করে বলেন ঃ 'ফা-লাম্মা তাওয়াফফায়তানি কুন্‌তা আন্‌তার রাক্বীবা আলাইহিম।' [(সূরা আল-মায়িদাহ্ ঃ ১১৮) অর্থঃ 'আর যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন একমাত্র তুমিই তাদের পরিদর্শক ছিলে' –অনুবাদক]।

এস্থলে আমরা কি 'তাওয়াফ্‌ফী' শব্দের 'নিদ্রা যাওয়া' বলে অর্থ গ্রহণ করতে পারি? এ অর্থ কি এ জায়গায় যথার্থ ও সমীচীন হবে (যেমন কিনা উলামা এ আয়াতের অর্থ করেন ঃ) 'তুমি যখন (হে আল্লাহ্!) আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলে আর গভীর ঘুমে আমাকে আচ্ছন্ন করলে তখন আমার ঘুমিয়ে পড়ার পর একমাত্র তুমিই তাদের পরিদর্শক ছিলে'? এ অর্থ এস্থলে কখনও প্রযোজ্য হয় না। বরং 'তাওয়াফ্‌ফী' শব্দটির সোজা-সরল ও সটিক অর্থ যে 'মৃতু' রয়েছে সেটিই এ জায়গায় সমীচীন ও যথার্থ ভাবে প্রযোজ্য। * তবে মৃত্যু বলতে সেই মৃত্যু নয় যা (উলামার ধারণায়) আকাশ থেকে নেমে আসার পর পুনরায় (তাঁর ওপর) আপতিত হবে। কেননা যে প্রশ্ন তাঁকে করা হয়েছে অর্থাৎ তাঁর উম্মতের বিকৃত (তথা পথ ভ্রষ্ট) হওয়ার সময়কার মৃত্যুর সঙ্গে উক্ত প্রশ্নের কোনো সম্পর্ক নেই। খ্রিষ্টানরা কি এখন 'সিরাতে-মুস্তাকীমে' প্রতিষ্ঠিত? এটা কি সত্য নয় যে, যে-বিষয়ে খোদা তা'লা ঈসা-ইবনে-মরিয়মকে প্রশ্ন করেছেন সে বিষয়টি তো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগ পর্যন্ত পূর্ণাকার ধারণ করে?

এতদ্ব্যতীত, পবিত্র হাদীস অনুযায়ীও হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুবরণ সপ্রমণিত। অতএব 'তফসীর মাআলিম'

---

* টীকা ঃ কুরআন করীমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে যে জায়গায় 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দটি এসেছে– সর্বত্রই 'তাওয়াফ্‌ফি'-এর অর্থ কেবল 'মৃত্যু' বলেই গৃহীত ও স্বীকৃত। –প্রণেতা।

গ্রন্থের ১৬২ পৃষ্ঠায় "ইয়া ঈসা ইন্‌নি মুতাওয়াফীকা ওয়া রাফিউকা ইলাইয়া" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৫৬) আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে লিখা আছে ঃ আলী-বিন-তালহা হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'এ আয়াতের অর্থ হলো ঃ 'ইন্‌নি মুমিতুকা' (অর্থ ঃ 'আমি তোমাকে মৃত্যু দিব')। এ আয়াতের উক্ত অর্থের সমর্থনে প্রমাণ পেশ করে আল্লাহ্ তা'লার নিম্নরূপ আয়াত সমূহ ঃ-

১। 'কুল্ ইয়াতাওয়াফ্‌ফাকুম মালাকুল মওতি'–[(সূরা আস্ সাজদাহ ঃ ১২) অর্থ ঃ মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা তোমাদের মৃত্যু দেবে –অনুবাদক]।

২। 'আল্লাযীনা তাতাওয়াফ্‌ফা হুমুল মালায়িকাতু যালেমী আনফুসিহিম [(আন নাহল ঃ ২৯) অর্থ ঃ 'ফিরিশতাগণ তাদের এমতাবস্থায় মৃত্যু দেবে যখন তারা নিজেদের আত্মার প্রতি অত্যাচারকারী হবে।' –অনুবাদক]। মোটকথা, হযরত ইবনে-আব্বাস রাযিয়াল্লাহ্ আনহুর আকিদা-বিশ্বাস এটাই ছিল যে, হযরত ঈসা (আ.) মারা গিয়েছেন। দর্শকগণ অবশ্যই জানেন যে হযরত ইবনে-আব্বাস কুরআন করীমের ব্যুৎপত্তি লাভে প্রথম সারির অন্তর্ভুক্তদের অন্যতম। এ ক্ষেত্রে তাঁর সপক্ষে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিশেষ এক দোয়াও রয়েছে।

অতঃপর, এ 'মাআলিম' তফসীর-গ্রন্থেই লেখা রয়েছে, 'ওহ্‌ব' হতে বর্ণিত যে, হযরত ঈসা (আ.) তিন ঘন্টার জন্য মারা গিয়েছিলেন। আর মুহাম্মদ-বিন-ইসহাক হতে বর্ণিত, খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস হলো তিনি সাত ঘন্টা পর্যন্ত মৃতাবস্থায় ছিলেন। কিন্তু উক্ত গ্রন্থের লেখক এজন্য বিস্মিত যে, সাত ঘন্টা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ সম্পর্কে মুহাম্মদ বিন-ইসহাক খ্রিষ্টানদের কোন্ পুস্তকাদি থেকে তথ্য গ্রহণ করেছেন? কেননা খ্রিষ্টানদের তো সকল ফির্কার এ কথার ওপর মতৈক্য দৃশ্যমান যে, তিনি তিন ঘন্টা পর্যন্ত মৃতাবস্থায় ছিলেন। এরপর কবর থেকে তাঁকে আকাশের দিকে উঠানো হয়েছিল। চার ইঞ্জিল থেকেও এটাই প্রমাণিত। স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.) ইঞ্জিলসমূহে তিন দিনের জন্য তাঁর মৃত্যুবরণের কথা ঘোষণা করেন।' মোটকথা, তাঁর মৃত্যুবরণ স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত। উল্লেখিত এসব প্রমাণ ছাড়াও তার মৃত্যুবরণ সম্পর্কে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃতি রয়েছে। আর ধারাবাহিক ভাবে সংরক্ষিত ঐতিহাসিক প্রমাণাদি তাঁর মৃত্যুবরণ সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করে। পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতেও ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দেয়া হয়েছিল।

মৃত্যুর পর আবার কিনা তাঁর আত্মা তাঁর সেই ভৌতিক দেহে প্রবেশ করে আর সেই দেহ জীবিত হয়ে আকাশে উত্থিত হয়– এটা একেবারেই অসত্য ও অলীক ধারণা। সমগ্র ঐশী-গ্রন্থাবলীর ঐক্যমতে এটা প্রমাণিত যে, সকল নবী ও ওলি-আল্লাহ্ মৃত্যুবরণের পর পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠেন অর্থাৎ এক ধরণের জীবন তাঁদের দান করা হয়– যা অন্যদের দান করা হয় না। এ (গুঢ়তত্ত্বের) দিকেই সেই হাদীসটি ইঙ্গত করে যেখানে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, "খোদা তা'লা আমাকে কবরে মৃতাবস্থায় রেখে দেবেন না।* বরং জীবিত করে আমাকে তিনি নিজের দিকে ওঠাবেন (পুনরুত্থিত করবেন)। যুবুর ঃ ১৬ শ্লোকেও হযরত দাউদ (আ.) 'ওহী ইলাহী' তথা ঐশীবাণীর আলোকে বলেন যে 'তুমি (হে খোদা!) আমার আত্মাকে কবরে রেখে দিও না এবং তুমি তোমার পবিত্রতা মন্ডিত এ বান্দাকে বিকৃত হতে ও পঁচতে গলতে দিও না অর্থাৎ বরং তুমি আমাকে জীবিত করো এবং নিজের দিকে উঠিও'। অনুরূপভাবে শহীদগণের সপক্ষেও কুরআন করীম বলে ঃ

"ওয়ালা তাহ্‌সাবান্নাল্লাযীনা কুতিলু ফিসাবিলিল্লাহি আমওয়াতান বাল্ আহ্‌ইয়াউন ইন্দা রাব্বিহিম ইউরযাকুন।" (আলে ইমরান ঃ ১৭০) অর্থাৎ, 'খোদার পথে যারা নিহত হয়েছে তোমরা তাদের মৃত বলে মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের রিযিক দান করা হয়।'

(চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

---

* টীকা ঃ হাদীসটির আসল অনুবাদ হচ্ছে ঃ 'আমাকে (মৃত্যুর পর) চল্লিশ দিনব্যাপী কবরে রেখে দেয়ার চেয়ে খোদা তা'লার দরগায় বা দৃষ্টিতে আমার পদমর্যাদা অবশ্যই অনেক বেশি ও উচ্চতর বটে, অর্থাৎ আমি উক্ত সময়সীমার মধ্যেই জীবিত হয়ে আকাশের দিকে উত্থিত হবো।' এখন দেখা আবশ্যক, (মৃত্যুর পর) কবরে পুনর্জীবিত হয়ে আকাশের দিকে উত্থতি হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের মনিব ও অভিভাবক মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের তুলনায় হযরত ঈসার মর্যাদা কিসে বাড়তি ছিল? প্রকৃত সত্য এটাই যে, (আত্মিক মর্যাদায়) হযরত ঈসার জীবন তো হযরত মূসা (আ.)-এর জীবনের চেয়েও নিম্নস্তরের ছিল। অতএব পূর্ববর্তী সর্বজনমান্য বুযুর্গানের সর্বসম্মত অভিমত এবং মি'রাজ সম্পর্কিত হাদীসের জ্বলন্ত সাক্ষ্যের আলোকেও সহীহ্ ও সঠিক আকিদা-বিশ্বাস এটাই যে নবীগণ মৃত্যুর পর (আধ্যাত্মিক জগতে) ইহজাগতিক জীবন-সদৃশ (এক প্রকার) দৈহিক জীবনসহ জীবিতাবস্থায় রয়েছেন এবং শহীদদের তুলনায় অবশ্যই তাদের জীবন অধিকতর পরিপূর্ণ ও অধিকতর শক্তিশালী বটে। আর সবচেয়ে অধিক পরিপূর্ণ, সর্বাধিক শক্তিশালী ও মহামর্যাদাপূর্ণ জীবন হচ্ছে আমাদের মনিব ও অভিভাবক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবন। তাঁর উদ্দেশ্যে আমি ও আমার পিতা-মাতা চির উৎসর্গীকৃত। হযরত মসীহ্ তো কেবল দ্বিতীয় আকাশে তাঁর খালাতো ভাই ও তাঁর মুর্শিদ হযরত ইয়াহ্‌ইয়ার সাথে অবস্থান করছেন। কিন্তু আমাদের অভিভাবক ও মাওলা- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম (আধ্যাত্মিক) আকাশের সর্বোচ্চ মার্গে ও শীর্ষ মর্যাদায় অবস্থিত রয়েছেন, অর্থাৎ তাঁর অবস্থান-স্থল হলো "ইন্দা সিদ্‌রাতিল মুন্‌তাহা, বির-রাফী কিল আ'লা' (অর্থাৎ মি'রাজের শেষ মার্গ 'সিদ্‌রাতিল মুন্‌তাহা'-এর কাছে, তাঁর সর্ব মহান বন্ধু আল্লাহ্‌র পার্শ্বে –অনুবাদক) এবং উম্মতের সার্বিক 'সালাম ও সালাত' সদাসর্বদা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সমীপে পৌঁছানো হয়। "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সৈয়্যদেনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আ'লে সৈয়্যদেনা মুহাম্মাদিন আক্‌সারা মিম্মা সাল্লাইতা আলা আহাদিম্ মিন আম্‌বিয়ায়িকা ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।" (অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! তোমার সমগ্র নবীকুলের ওপর বর্ষিত 'সালাম ও সালাত, কল্যাণ ও আশিসের চেয়েও অধিক সংখ্যক ও বহুগুণ বেশি পরিমাণে বর্ষণ কর আমাদের মনিব ও অভিভাবক মুহাম্মদ ও তাঁর 'আল' (তথা প্রকৃত অনুসারীদের) ওপর' –অনুবাদক)।

জুমুআর খুতবা

খোদাভীতি অবলম্বনের গুরুত্ব

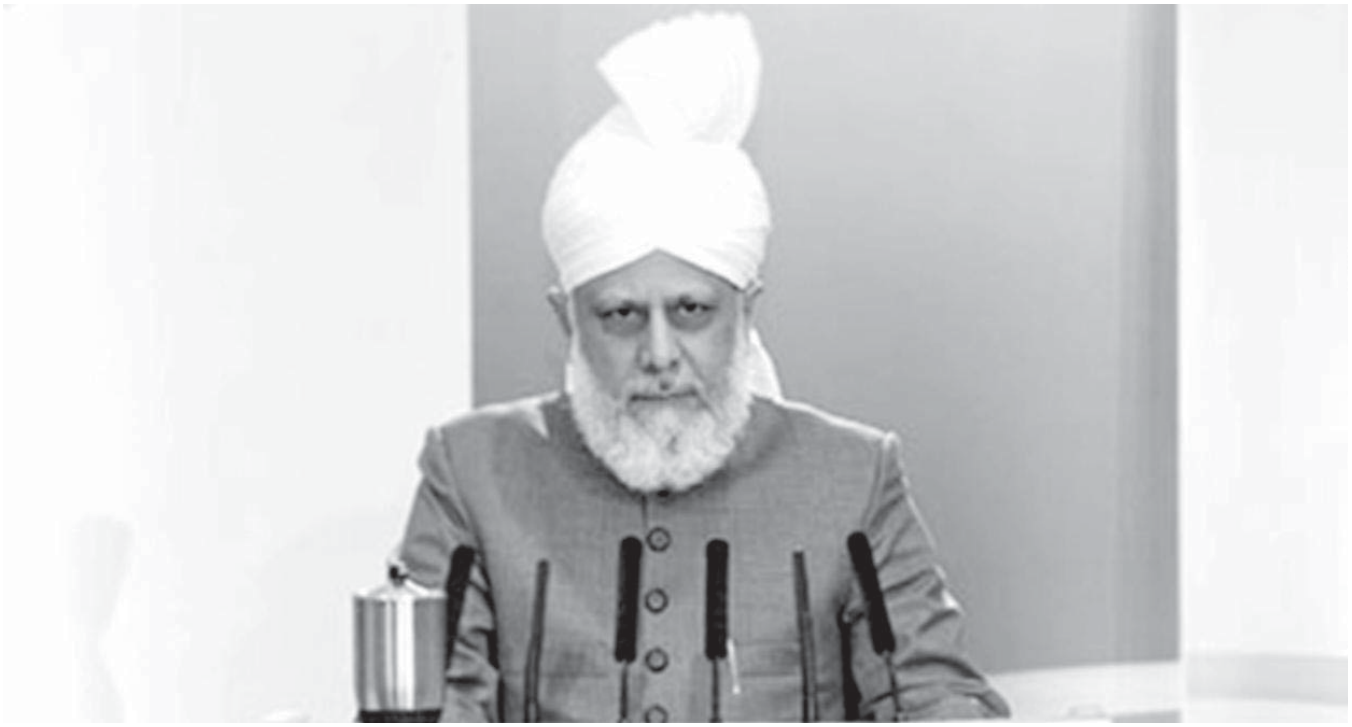

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১০ জুন, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআন থেকে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

(সূরা আল্-বাকারা: ১৮৪)

অর্থাৎ, হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য রোযা সেভাবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করতে পার।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা এমন একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যা আমাদের ইহ এবং পরকালকে সুন্দর ও সুসজ্জিতকরে, আর সেই বিষয়টি হলো, 'লায়াল্লাকুম তাত্তাকুন'। সুতরাং রোযা বিধিবদ্ধ করা এই দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, পূর্ববর্তী ধর্মগুলোতেও তা আবশ্যক ছিল বরং তোমাদের তাক্বওয়া অবলম্বনের দৃষ্টিকোণ থেকে রোযা গুরুত্বপূর্ণ যেন তোমরা পাপ এড়িয়ে চলতে পার বা পাপ বর্জন করতে পার। রোযা কী? রোযা হলো আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য এক মাস সেসব বৈধ কার্যকলাপ থেকেও বিরত থাকা সাধারণ অবস্থায় যার অনুমতি রয়েছে। সুতরাং এ মাসে মানুষ যেখানে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য বৈধ কার্যকলাপ থেকেও বিরত থাকার চেষ্টা করে একথা ভাবাই যায় না যে, সে অবৈধ কার্যকলাপ এবং পাপে লিপ্ত হবে। কেউ যদি এই চেতনা এবং প্রেরণা নিয়ে রোযা না রাখে যে, আমি খোদার সন্তুষ্টিকে অগ্রগণ্য করে এ দিনগুলো অতিবাহিত করব এবং প্রত্যেক সেই কথা কাজ থেকে বিরত থাকব যা থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন আর প্রত্যেক সেই কাজ করব যা করার আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন। যদি এই চেতনা এবং এই প্রেরণা দৃষ্টিপটে না থাকে, সবসময় আমাদের সামনে না থাকে, আর এ অনুসারে যদি জীবন যাপনের চেষ্টা না করা

হয় তাহলে এই রোযা অর্থহীন এবং নিরর্থক।

মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদেরকে কেবল ক্ষুধার্ত রাখার আল্লাহ্ তা'লার কোন প্রয়োজন নেই। রোযার মূল ও প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের উন্নতি করা। আল্লাহ্ তা'লা প্রশিক্ষণের জন্য একটি মাস দিয়েছেন। এতে নিজেদের তাক্বওয়ার মানকে উন্নত কর। এই তাক্বওয়া তোমাদের পুণ্যের মানকে উন্নত করবে, তোমাদেরকে স্থায়ী পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবে, খোদার নৈকট্যও দান করবে আর একই সাথে অতীতের পাপও মোচন হবে। মহানবী (সা.) একবার বলেন, যে ব্যক্তি ঈমানের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে রমযানের রোযা রাখে এবং আত্মসংশোধনের চেতনা নিয়ে রাখে তার অতীতের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এখন অতীতের পাপ যদি মোচন হয় বা ক্ষমা করে দেয়া হয় আর তাক্বওয়া অবলম্বনের পর মানুষ যদি এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে হয় তাহলে এমন মানুষ অবশ্যই রমযান অতিবাহিত করার যেই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য রয়েছে সে ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছে বরং জীবনের উদ্দেশ্যও সে অর্জন করেছে। তাক্বওয়ার যেসব উপকারিতা এবং কল্যাণ যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত আছে তার মাঝে একটি উপকারিতা যা আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং উল্লেখ করেছেন তাহলো,

فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

(সূরা আল্-মায়েদা: ১০১)

অর্থাৎ হে বুদ্ধিমানরা! খোদার তাক্বওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সাফল্য অর্জন করতে পার বা সফলকাম হতে পার। সুতরাং কে এমন হবে যে সাফল্য চায় না। ইহজাগতিক সাফল্য এ জগতেই থেকে যাবে। প্রকৃত সফলতা হলো, উভয় জগতের সাফল্য অর্জন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি তোমরা বুদ্ধিমান হয়ে থাক তাহলে শোন! তাক্বওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেই তা লাভ হতে পারে। আজ যেখানে নামধারী আলেমরা ধর্মের নামে মুসলমানদের দ্বারা এমন সব কাজ করাচ্ছে যা সম্পূর্ণরূপে খোদার ইচ্ছা পরিপন্থী এবং তাক্বওয়া বিবর্জিত সেখানে আহমদীরা পরম সৌভাগ্যবান! কারণ তারা যুগ ইমাম এবং মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিককে মানার সৌভাগ্য লাভ করেছে– যিনি আমাদেরকে ইসলামী শিক্ষার প্রতিটি সূক্ষ্ম দিক সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

তাক্বওয়া কি আর তাক্বওয়া কোন কোন বিষয়ের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে? জামাতের সভ্য এবং সদস্যদের কাছে এই বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কী প্রত্যাশা রাখেন? এসব বিষয় বোঝা এবং জানার জন্য আজ আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কতিপয় উদ্ধৃতি নির্বাচন করেছি যা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। এগুলো সেই পথের দিশারী কথা যা আমাদেরকে ঈমানে সুদৃঢ় করে, তাক্বওয়ায় উন্নত করে, আর তাক্বওয়া অর্জনের জন্য যেই তরবীয়ত এবং প্রশিক্ষণের মাস আমরা অতিবাহিত করছি তার কর্মপন্থা নির্ধারণ করে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, তাক্বওয়া কোন সামান্য বিষয় নয়। এর মাধ্যমে সেসব শয়তানের মোকাবিলা করতে হয় যারা মানুষের প্রতিটি আভ্যন্তরীণ শক্তি এবং সামর্থের ওপর ছেয়ে আছে। এসব শক্তি নফসে আম্মারা অর্থাৎ অবাধ্য প্রবৃত্তির প্রাধান্যের সময় মানুষের ভেতর এক শয়তান অর্থাৎ পাপে প্ররোচনা দাতা যেসব শক্তি রয়েছে বা যেসব চিন্তাধারা মানুষকে পাপের দিকে পরিচালিত করে এবং পুণ্য থেকে বিরত রাখে তা-ই মানুষের আভ্যন্তরীণশয়তান। তিনি (আ.) বলেন, যদি এসব শক্তি এবং বৃত্তির সংশোধন না হয় অর্থাৎ তোমাদের মাঝে অবাধ্য প্রবৃত্তিরূপী যে শয়তান রয়েছে– যদি এসবের সংশোধন না কর বা এর যদি সংশোধন না হয় তাহলে কি হবে? এরফলে তা মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করবে।

তিনি (আ.) বলেন, জ্ঞান এবং বুদ্ধির অন্যায় ব্যবহারের ফলে মানুষ শয়তান হয়ে যায়। জ্ঞান খুব ভালো জিনিস। মানুষ যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে অনেক মহান কাজ করতে পারে। কিন্তু মানুষ যদি নিজেদের এই জ্ঞান এবং বুদ্ধি নিয়ে অহংকার আরম্ভ করে, এগুলোকে যদি অন্যায় কাজে ব্যবহার করে অথবা পুণ্যের মোকাবিলায় বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যদি এসবকে দাঁড় করায় তাহলে তা শয়তান শয়তানে রূপ নেয়। তিনি (আ.) বলেন, মুত্তাকী বা খোদাভীরু মানুষের কাজ হলো, এগুলোকে এবং এমন অন্যান্য শক্তিবৃত্তিকে ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলা। জ্ঞান, বুদ্ধি এবং অন্যান্য যোগ্যতা ও শক্তি-সামর্থ্য বা শক্তিবৃত্তি যা আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন তা যথাযথ স্থানে ব্যবহার করা হলো সত্যিকার মুত্তাকির কাজ। নতুবা যদি সঠিক স্থানে ব্যবহার না হয় তাহলে এসব বিষয়ই মানুষের ক্ষতি করে, আল্লাহ্ থেকে দূরে ঠেলে দেয় এবং শয়তানের নিকটতর করে।

আরেক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, তাক্বওয়ার বিষয়টি অতীব সূক্ষ্ম, তা অর্জন কর। আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্যকে হৃদয়ে স্থান দাও। যার কাজ-কর্মে সামান্যতম লোকদেখানো ভাবও থাকে আল্লাহ্ তা'লা তার কর্মকে তার মুখেই ছুঁড়ে মারেন। কোন কাজে বা কর্মে যেন লোকদেখানোভাব বা কৃত্রিমতা না থাকে। যদি এমনটি হয় তাহলে সেই কাজ আল্লাহ্‌র জন্য নয়। সেটি ইবাদত হোক বা কুরআন তিলাওয়াতই হোক বা রোযা হোক বা অন্য যে কোন পুণ্যই হোক না কেন। তিনি (আ.) বলেন, মুত্তাকী হওয়া কঠিন বিষয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কেউ যদি তোমাকে বলে যে, তুমি কলম চুরি করেছ তাহলে তুমি রাগ কেন কর? কেউ যদি বলে, আমার কলম এখানে পড়েছিল, তুমি তা চুরি করেছ, তখন একথা শুনে তুমি ক্ষেপে যাও কেন? তোমার অন্যায় থেকে বিরত থাকা সম্পূর্ণরূপে যদি খোদার সন্তুষ্টির জন্য হয়ে থাকে, যদি তাক্বওয়া থাকে, পুণ্য থাকে, তাহলে রাগ বা ক্রোধ থেকে বিরত থাকা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে আমিত্বের দাসত্ব করো না বরং তোমার আমল বা কর্মকে খোদার সন্তুষ্টির অধীনস্ত কর।

তিনি (আ.) বলেন, রাগ করার অর্থ হলো তুমি সত্যের ওপর নও অর্থাৎ তোমার আসল উদ্দেশ্য খোদার সন্তুষ্টি ছিল না বরং তুমি তোমার অহমিকার দাসত্ব করছ। যতক্ষণ মানুষের জীবনে অগণিত মৃত্যু না আসবে সে মুত্তাকী হতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, মু'জিযা বা নিদর্শন এবং ইলহামও তাক্বওয়ারই বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা। মূল হলো তাক্বওয়া। কেউ যদি বলে, আমার প্রতি ইলহাম হয়, আমি নিদর্শন দেখিয়ে থাকি, তাহলে তাক্বওয়ার কল্যাণে তা একটি অতিরিক্ত দিক। আসল বিষয় হলো তাক্বওয়া। তাই ইলহাম এবং রুইয়্যার পিছনে ছুটবে না বরং তাক্বওয়া অর্জনের চেষ্টা কর। যে মুত্তাকী হয়ে থাকে তার ইলহামই সঠিক। যদি তাক্বওয়া বা খোদাভীতি ও খোদাভীরুতা না থাকে তাহলে ইলহামও নির্ভরযোগ্য নয়, এতে শয়তানের ভূমিকা থাকতে পারে। কেউ ইলহাম লাভ করে, এই দৃষ্টিকোণ থেকে তার তাক্বওয়া যাচাই করো না, একথা মনে করো না যে, সে বড় নেক, বড় মুত্তাকী, দিব্যদর্শনের অভিজ্ঞতা রাখে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবে না বরং তার ইলহামকে তার

তাক্বওয়ার মাপকাঠিতে যাচাই করবে। সেসব ইলহাম সঠিক বা সত্য কিনা তা যাচাই করতে হলে দেখ তার মাঝে তাক্বওয়া আছে কিনা। অনেক বিষয় ছোট ছোট হয়ে থাকে।

তিনি (আ.) একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। কেউ যদি বলে, তুমি আমার এই জিনিস চুরি করেছ, এটি শুনে রেগে যাওয়া, ক্ষেপে যাওয়া, নিজের অধিকারের জন্য অন্যের ক্ষতি করা সঠিক নয়। এই বিষয়গুলো মেনে চলা হলো, তাক্বওয়া। যদি এসব না থাকে তাহলে কেউ যদি লক্ষবারও বলে যে, আমি বহু সত্য স্বপ্ন দেখি, আমার দিব্যদর্শনের অভিজ্ঞতা আছে, একথাগুলোর সবই ভ্রান্ত এবং মিথ্যা। চতুর্দিক দিক থেকে চোখ বন্ধ করে তাক্বওয়ার মাইল ফলক অতিক্রম কর। নবীদের আদর্শ অনুকরণ কর। যত নবী এসেছেন সবার উদ্দেশ্য একটিই ছিল, আর তাহলো, তাক্বওয়ার পথ দেখানো এবং শেখানো।

إِنْ أَوْلِيَآؤُهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ

(সূরা আল্-আনফাল: ৩৫)। কুরআন শরীফ তাক্বওয়ার সূক্ষ্ম পথের দিশা দিয়েছে। নবীর পরাকাষ্ঠা উম্মতের পরাকাষ্ঠার দাবি রাখে। মহানবী (সা.) যেহেতু খাতামান্নাবিঈন ছিলেন তাই তাঁর পবিত্র সত্তায় নবুয়্যতের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যাবলী পরম মার্গে উপনীত হয়েছে। নবুয়্যতের শ্রেষ্ঠ দিকগুলো পরম মার্গে পৌছার মাধ্যমেই নবুয়্যতের সমাপ্তি ঘটেছে। যে আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে চায় এবং নিদর্শন দেখতে চায় আর অলৌকিকভাবে দেখতে চায় তার জন্য আবশ্যক হবে নিজের জীবনকে অলৌকিক করে তোলা। অতএব এই বিপ্লব আমাদের মাঝে আনয়ন করার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা যদি মহানবী (সা.)-এর মান্যকারী এবং তাঁর উম্মতভুক্ত হয়ে থাকি তাহলে তিনিই আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ, তাঁর উত্তম আদর্শ অনুকরণ-অনুসরণ করা উচিত। আর এর জন্য আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা আবশ্যক এবং প্রকৃত তাক্বওয়া সৃষ্টি হওয়া চাই।

'সব পুণ্যের মূল হলো তাক্বওয়া' এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, তাক্বওয়া অবলম্বন কর। তাক্বওয়া সব কিছুর মূল। তাক্বওয়া শব্দের অর্থ হলো, প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পাপের বিচরণস্থল এড়িয়ে চলা। তাক্বওয়া হলো– যে বিষয়ে সন্দেহ জাগে যে, এটি পাপে পর্যবসিত হতে পারে তাও এড়িয়ে চল। কেবল প্রকাশ্য পাপতে এড়িয়ে চলবেই বরং যদি সন্দেহ থাকে, যে যদি এবিষয়টি পাপে পর্যবসিত হতে পারে তাহলে তাও এড়িয়ে চল। তিনি (আ.) বলেন, হৃদয়ের দৃষ্টান্ত হলো, একটি বড় নহর বা নদীর মতো যা থেকে ছোট ছোট খাল বা নালা বের হয়। পাঞ্জাব, হিন্দুস্তান এবং পাকিস্তানে ছোট নহরকে আঞ্চলিক ভাষায় 'সূয়া' বা 'রাজবাহা' বলা হয়। তিনি (আ.) বলেন, হৃদয়ের নহর থেকেও ছোট ছোট নালা নির্গত হয় যেমন জিহ্বা, হাত ইত্যাদি আর সেই সমস্ত সেসব কাজের প্রভাব হৃদয়ের ওপর পড়ে থাকে। ছোট নহর বা নালার পানি যদি নোংরা এবং ময়লা হয় তাহলে অনুমান করা হয় যে, বড় নহরের পানিও দূষিত। সুতরাং যদি দেখ যে, কারো জিহ্বা বা হাত অথবা পা তথা কোন অঙ্গ অপবিত্র তাহলে ধরে নিতে পার যে, তার হৃদয়ও এমন। যদি কারো মুখ নোংরা হয় আর রোযা রাখা সত্ত্বেও ঝগড়া-বিবাদ এবং গালমন্দ থেকে বিরত না হয় বা তার হাতেযদি অন্যায় কাজ সাধিত হয় তাহলে ধরে নিতে পার, তার হৃদয়ও পরিচ্ছন্ন নয় এবং সে তাকওয়া থেকে দূরে।

দীনহীনের ন্যায় জীবন যাপন করা উচিত আর এ বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, তাক্বওয়াশীলদের জন্য শর্ত হলো, দীনহীনের ন্যায় জীবন যাপন করা। এটি তাক্বওয়ারই একটি শাখা যার মাধ্যমে আমাদের অনর্থক রাগ এবং ক্রোধের মোকাবিলা করতে হবে। রাগ এবং ক্রোধ যদি সঠিক এবং যথাস্থানে প্রকাশ করা হয় তাহলে তা বৈধ কিন্তু অবৈধ রাগ এবং ক্রোধ, ছোট ছোট বিষয়ে রাগ ও ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত থাক। বড় বড় তত্ত্বজ্ঞানী এবং সত্যবাদীদের জন্য শেষ ও কঠিন গন্তব্য হলো ক্রোধ এবং রাগ বর্জন।

সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো, রাগ এবং ক্রোধ থেকে বিরত থাকা, আবেগ অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করা। আত্মশ্লাঘা এবং আত্মম্ভরিতা রাগ থেকেই উদ্ভূত হয়। অনুরূপভাবে কোন কোন সময় রাগ এবং ক্রোধ আত্মশ্লাঘা এবং আত্মম্ভরিতায় পর্যবসিত হয়। আর রাগের কারণ হলো, মানুষের মাঝে অহংকার রয়েছে যে, সে নিজেকে মনে করে, কিছু একটা হনুরে, বিনয় নেই। আজ ঘর থেকে আরম্ভ করে সর্বোচ্চ স্তরে এই রাগই নৈরাজ্য সৃষ্টি করে রেখেছে। রাগ তখন হয় যখন মানুষ নিজেকে অন্যের ওপর প্রাধান্য দেয়।

তিনি (আ.) বলেন, আমি চাই না যে, আমার জামাতের সদস্যরা পরস্পর পরস্পরকে বড় বা ছোট মনে করবে বা একে অন্যের ওপর গর্ব করবে বা অন্যদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখবে। আল্লাহ্ তা'লাই জানেন কে বড় আর কে ছোট। এটি এক প্রকার তাচ্ছিল্য করা বৈ-কি। যার মাঝে এই অভ্যাস রয়েছে, আশঙ্কা রয়েছে যে, বীজের মতো অঙ্কুরিত হয়ে তা তার জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে। কাউকে যদি তুচ্ছ মনে কর, ছোট বা হেয় মনে কর, কাউকে যদি হাসি-ঠাট্টা কর এবং হেয় দৃষ্টিতে দেখ; তাহলে এই বিষয়গুলো তাচ্ছিল্য বৈ আর কি। আর এই বীজ যদি হৃদয়ে দানা বাধে তাহলে সেটি অঙ্কুরিত হয় এবং মহিরূহে পরিণত হয় আর মানুষকেধ্বংস করে।

তিনি (আ.) বলেন, এটি পরিহার কর। অনেকেই বড়দের সাথে সাক্ষাতে পরম বিনয় প্রদর্শন করে। কিন্তু বড় সে যে দীনহীনের কথাও বিনয়ের সাথে শুনে, তাদের মন জয় করে এবং তাদের কথাকে সম্মান করে। ব্যঙ্গ বা উপহাসমূলক কোন বলা উচিত নয় যার ফলে কেউ দুঃখ পেতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

(সূরা আল্-হুজুরাত: ১২)।

তিনি (আ.) বলেন, তোমরা পরস্পরের বিদ্রুপাত্মক নাম রাখবে না। এটি দুরাচারী, অনাচারী এবং পাপাচারীদেরই কাজ। কারো ব্যঙ্গাত্মক বা উপহাসমূলক কোন নাম রাখারমত কাজ তারা করে যারা ধর্ম থেকে বিচ্যুত, সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত। 'ফাজের' তারা যারা সঠিক পথ ছেড়ে দেয়, মিথ্যাবাদী, পাপাচারী দুশ্চরিত্র, আনুগত্যের গন্ডি থেকে বহিস্কৃত– এমন মানুষকেই ফাজের বলা হয়।যে ব্যক্তি কারো এমন ব্যঙ্গাত্মক নাম রাখে সে ততক্ষণ পর্যন্ত মরবে না যতক্ষণ স্বয়ং এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন না হয়। ভাইদেরকে তুচ্ছ মনে করবে না। সবাই যখন একই প্রস্রবণ থেকে পান করছ তখন কে জানে কার ভাগ্যে বেশি পানি রয়েছে। কোন জাগতিক নীতির ভিত্তিতে কেউ সম্মানিত হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে বড় সে যে মুত্তাকী।

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

(সূরা আল্-হুজুরাত: ১৪)।

এরপর মুত্তাকী কে এ বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে মুত্তাকী তারাযারা নম্রতা এবং দীনতার মাঝে জীবন যাপন করে। তারা অহংকার সূচক কথা বলে না। তাদের কথাবার্তা এমন হয় যেভাবে কোন স্বল্প বয়স্ক বালকজ্যেষ্ঠদের সাথে কথা বলে। যেভাবে এক বালক বয়স্ক ব্যক্তি জ্যোষ্ঠের সাথে বা দরিদ্র যেভাবে ধনীর সাথে কথা বলে তারাও সেভাবে কথা বলে। বড় এবং ধনী হওয়া সত্ত্বেও তাদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা পরম বিনয়ের সাথে কথা বলে। আমাদের সর্বাবস্থায় সেই কাজ করা উচিত যার মাঝে আমাদের কল্যাণ বা সাফল্য নিহিত। আল্লাহ্ তা'লা কারো ঠিকা নেন নি। তিনি তাক্বওয়া চান। যে তাক্বওয়া অবলম্বন করবে সে সুমহান মর্যাদায় উপনীত হবে।

মহানবী (সা.) বা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মাঝে কেউ উত্তরাধিকার সূত্রে সম্মান লাভ করেন নি। যদিও আমাদের বিশ্বাস রয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর সম্মানিত পিতা আব্দুল্লাহ্ পৌত্তলিক ছিলেন না, কিন্তু তিনি তো নবুয়্যত দিয়ে যান নি। এটি খোদার কৃপা ছিল সেসব নিষ্ঠার কারণে যা তার প্রকৃতির অংশ ছিল। এটিই ফযল এবং কৃপাকে আকর্ষণ করেছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) যিনি নবীকূল-পিতা ছিলেন, তিনি তার নিষ্ঠা এবং তাক্বওয়ার কল্যাণেই পুত্রকে উৎসর্গ করতে দ্বিধা করেন নি। স্বয়ং আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। আমাদের নেতা এবং মনীব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা দেখুন!তিনি (সা.) সকল প্রকার নোংরা ও অপবিত্র আন্দোলনের মোকাবিলা করেছেন, বিভিন্ন প্রকার সমস্যা এবং কষ্ট সহ্য করেছেন কিন্তু ভ্রুক্ষেপ করেন নি। এই নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার কারণেই আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন। সুতরাং এই হলো মহান আদর্শ যা আমাদের জন্য অনুকরণীয়।

এরপর সত্যিকার অন্তঃদৃষ্টি এবং বিচক্ষণতাকীভাবে অর্জন করা যায় সে সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, সত্যিকার অন্তঃদৃষ্টি এবং প্রকৃত বুদ্ধি খোদার দিকে প্রত্যাবর্তণছাড়া অর্জন হতেই পারে না। এ কারণেই বলা হয়েছে, মু'মিনের অন্তঃদৃষ্টিকে ভয় কর কেননা, সে খোদা তা'লার জ্যোতিতে দেখে। যতক্ষণ তাক্বওয়া না থাকবে ততক্ষণ সত্যিকার অন্তঃদৃষ্টি এবং সত্যিকার বুদ্ধি ও মেধা অর্জন হওয়া সম্ভব নয়। তিনি (আ.) বলেন, যদি তোমরা সফল হতে চাও তাহলে বিবেক-বুদ্ধি খাটাও, চিন্তা কর, ভাব। চিন্তা এবং প্রণিধানের ওপর পবিত্র কুরআনে বারবার জোরালো নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

একদিকে কোন ব্যক্তি যদি নিজের জ্ঞান এবং বুদ্ধিকে ভ্রান্তভাবে ব্যবহার করে তাহলে তা তার জন্য ধ্বংস ডেকে আনে, অপর দিকে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, বিবেক খাটাও, বুদ্ধি খাটাও জ্ঞানকে কাজে লাগাও, চিন্তা ও প্রণিধান কর। তিনি (আ.) এ সম্পর্কে বলেন, কুরআনে বারবার এ সম্পর্কে তাকিদী নির্দেশ রয়েছে। তিনি বলেন কিতাব মকনূন (প্রচ্ছন্ন গ্রন্থ) কুরআন তথা আল্লাহ্‌র কিতাব সম্পর্কে চিন্তা কর, তা পড়, এর সূক্ষ্ম বিষয়াদি জানার চেষ্টা কর, এর অনুবাদ পড়, তফসীর পড়। রমযান মাসে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, দরসও হয়, সেদিকে মনোযোগ দাও। এবং পবিত্র ও মুত্তাকী প্রকৃতির অধিকারী হয়ে যাও। তোমাদের হৃদয় যদি পবিত্র হয়ে যায় একই সাথে বিবেক-বুদ্ধি যদি খাটাও, তাক্বওয়ার সূক্ষ্ম পথগুলো যদি অনুসরণ কর তাহলে এই উভয়েরযোগসূত্রে সেই অবস্থা সৃষ্টি হবে যা হলো,

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(সূরা আলে ইমরান: ১৯২)

তিনি (আ.) বলেন, তোমাদের হৃদয় থেকে যখন এই দোয়া উদ্ভূত হবে তখন বুঝতে পারবে যে, এই সৃষ্টি বৃথা নয় বরং তা সত্যিকার স্রষ্টার সত্যতা এবং অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে যেন ধর্মের জন্য সহায়ক বিভিন্ন জ্ঞান ও প্রযুক্তি সামনে আসে। একদিকে জ্ঞান এবং বুদ্ধি আধুনিক যুগের লোকদেরকে খোদা থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, জ্ঞান এবং মেধা ও বুদ্ধিকে যদি কাজে লাগাও তাহলে আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র সত্তাকে জানতে পারবে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন হবে।

আজকাল মানুষ বলে, খোদা নেই। খোদাকে তারা এই কারণে দেখে না যে, তাদের ধর্মের চোখ অন্ধ। নিজেদের বুদ্ধি আর মেধাকে কেবল জাগতিক মাপকাঠিতে যাচাই করে, তাদের দৃষ্টি কেবল দুনিয়ার প্রতি এবং বস্তু জগতের প্রতি। তারা ধর্ম থেকে এই জন্য বিচ্যুত হয়েছে যে, তাদের ধর্ম সেকেলে এবং পুরোনো হয়ে গেছে। খোদার ঐশী দিক নির্দেশনা তাদের আর লাভ হয় । তাই এ সম্পর্কে চিন্তা করা বা এই ক্ষেত্রে বিবেক বুদ্ধিকে কাজে লাগানো তাদের জন্য সম্ভব নয়। আমাদের জন্য ধর্মীয় গ্রন্থ হলো পবিত্র কুরআন। তা চিরকালের জন্য জ্ঞান এবং তত্ত্বের ভান্ডার। কুরআন সম্পর্কে চিন্তা এবং প্রণিধান মানুষকে তাক্বওয়ায় উন্নত করে, খোদার সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানুষ যখন তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করে তখন আল্লাহ্ তা'লাকে দেখতে পায়। তাক্বওয়া হলো, খোদা দর্শনের আয়না। এরপর প্রণিধানকারী এবং তাক্বওয়ায় যারা উন্নতি করেতারা আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তাকে পর্বত শৃঙ্গেও দেখতে পায়, গভীর উপত্যকায়ও দেখতে পায়, নদী এবং সমুদ্রেও দেখতে পায় আর চন্দ্র এবং সূর্যেও দেখতে পায়। বিশ্ব জগতের বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রে আল্লাহ্‌র সত্তাকে তারা খুঁজে পায়।

একজন প্রকৃত মু'মিন কেবল শুষ্ক যুক্তি এবং দর্শনের অন্ধ অনুকরণ করে না বরং খোদার সাথে নিবিড় সম্পর্ক বন্ধন স্থাপন করে খোদার সত্তা থেকে জ্যোতি লাভ করে। রোযার মাসে সেই আলোর সন্ধান করাও আমাদের জন্য আবশ্যক, কেননা রমযানের উদ্দেশ্য হলো জাগতিক বা বাহ্যিক আহার কমিয়ে আধ্যাত্মিক খোরাকের সন্ধান করা, আর এক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি করার চেষ্টা করা উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ উদ্দেশ্যে বলেন, প্রত্যেকের আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করা উচিত, নিজের নফসকে পবিত্র করার চেষ্টা করা উচিত, নিজের শক্তি-বৃত্তি বা শক্তি-সামর্থ্যকে পবিত্র করার চেষ্টা করা উচিত। যদি শক্তি-বৃত্তি এবং সামর্থ্যের সঠিক ব্যবহার করতে হয় তাহলে এসবকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন কর। আর এটিই সেই তাক্বওয়া যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে চান।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, যদি জামাতভুক্ত হয়ে থাক, ইসলামের সেবা যদি করতে চাও তাহলে প্রথমে স্বয়ং তাক্বওয়া এবং পবিত্রতা অবলম্বন কর।শুধু কথার খৈ ফুটিয়ে ইসলামের সেবা করা সম্ভব নয় বরং আমাদের তাক্বওয়া এবং পবিত্রতা অবলম্বন করা আবশ্যক। এরপর বিষয়ের ধারাবাহিকতা অব্যহত রাখতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

আমি পুনরায় আসল বিষয়ের দিকে ফিরে আসছি অর্থাৎ 'সাবেরু ওয়া রাবেতু' (সূরা আলে ইমরান: ২০১)। যেভাবে শত্রুর মোকাবিলায় সর্বদা সীমান্তে ঘোড়া বাঁধা থাকা আবশ্যক হয়ে থাকে যেন শত্রু সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারে অনুরূপভাবে তোমরাও প্রস্তুত থাক। 'সাবেরু ওয়া রাবেতু'-র তফসীরে তিনি (আ.) এসব কথা বলেন। সীমান্তে ঘোড়া বাঁধা হয় শত্রু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, সৈন্য দাঁড় করানো হয় যেন শত্রু তোমাদের সীমানা অতিক্রম করতে না পারে। অনুরূপভাবে তোমরাও সৈনিকদের মত প্রস্তুত থাক যেন কোথাও শত্রু সীমান্ত অতিক্রম করে ইসলামের ক্ষতি করতে না পারে।

তিনি (আ.) বলেন, আমি পূর্বেও বলেছি, যদি ইসলামের সহায়তা এবং সেবা করতে চাও তাহলে প্রথমে স্বয়ং তাক্বওয়া অবলম্বন কর আর পবিত্র হও যার কল্যাণে তোমরা খোদা তা'লার আশ্রয়ের দুর্ভেদ্য দূর্গে প্রবেশ করতে পারবে এবং এরফলে তোমরা সেবার সেই সম্মান এবং যোগ্যতা লাভ করবে যার মাধ্যমে তোমরা খোদা তা'লার নিরপত্তার দুর্ভেদ্য দূর্গে স্থান পাবে এবং একই সাথে তোমরা এই খিদমতের সম্মান এবং যোগ্যতাও লাভ করবে। খোদার নিরাপত্তার বেষ্টনীতে স্থান পেলে ইসলামের হিফাযতেরবা খিদমতের সম্মান তোমরা লাভ করবে এবং তোমাদের অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে কেননা; তোমরা নিজেদের সংশোধন করেছ এবং তাক্বওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছ।

তিনি (আ.) বলেন, তোমরা দেখছ যে, জাগতিক দিক থেকে মুসলমানরা কতটা দুর্বল হয়ে পড়েছে, বিভিন্ন জাতি তাদেরকে ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। তোমাদের আভ্যন্তরীণ শক্তিও যদি হারিয়ে যায়বা দুর্বল হয়ে যায় তাহলে ধ্বংস নিশ্চিত বলে ধরে নিতে পার। তোমরা নিজেদের হৃদয়কে এমনভাবে পরিশুদ্ধ কর যেন পবিত্র শক্তি তাতে স্থান পায় এবং সীমান্তে বাঁধা ঘোড়ার মত তা যেন দৃঢ় ও হিফাযতকারী হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লার ফযল সব সময় মুত্তাকী এবং সরল প্রাণ লোকদের সাথে থাকে। নিজেদের চরিত্র এবং রীতি-নীতি এমন করো না যার ফলে ইসলামের দুর্নাম হতে পারে। যেসব মুসলমান অপকর্মশীল এবং যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করে না তাদের কারণে ইসলামের দুর্নাম হয়। কোন মুসলমান মদ পান করে কোন স্থানে গিয়ে বমি করে, পাগড়ী গলায় থাকে, সে গর্ত এবং নোংরা নালা-নর্দমায় পড়তে থাকে, তার ওপর পুলিশের জুতা পড়ে, হিন্দু এবং খ্রিষ্টানরা তাকে দেখে হাসি-ঠাট্টা করে। তার এমন শরীয়ত পরিপন্থী কাজ কেবল তারই হাসি-ঠাট্টার কারণ হয় না বরং পক্ষান্তরে এর প্রভাব পড়ে ইসলামের ওপর, এর মাধ্যমে ইসলামের দুর্নাম হয়। একটা ছোট দল হলেও বা সন্ত্রাসী ও অপকর্মশীল মানুষ কতিপয় হলেও আজকাল কেউ একথা বলে না যে, এদের সংখ্যা খুবই কম বরং তারা ইসলামেরই দুর্নাম করে, ইসলামকে অভিযুক্ত করা হয় যে ইসলামের শিক্ষাই এমন। ইসলামের সাথে সম্পর্কের দাবিদার কোন ব্যক্তির আচার-আচরণ বিরোধীদেরকে অঙ্গুলী নির্দেশ করার সুযোগ দেয়।

তিনি (আ.) বলেন, জেলখানার রিপোর্টে এ সংক্রান্ত সংবাদ পড়ে আমি যারপরনাই মর্মাহত হই যখন আমি দেখি যে, মুসলমানরা অপকর্মের কারণে এভাবে শাস্তি পেয়েছে। আমার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে যায় যে, এরা যারা সঠিক-সরল বা সত্য ধর্মের অনুসারী তারা নিজেদের ভারসাম্যহীনতার কারণে শুধু নিজেদেরই দুর্নাম করে না বরং ইসলামকেও হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করে। তিনি (আ.) বলেন, আমার কথার উদ্দেশ্য হল, তারা মুসলমান আখ্যায়িত হয়েও এমন নিষিদ্ধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয় যা শুধু তাদেরকেই নয় বরং ইসলামকেও সন্দেহ যুক্ত করে তুলে। তিনি (আ.) বলেন, অতএব নিজেদের চাল-চলন এবং আচার-আচরণ এমন বানাও যেন অবিশ্বাসীরাও তোমাদের সম্পর্কে সমালোচনার কোন সুযোগ না পায়, যা সত্যিকার অর্থে ইসলামের ওপরই বর্তায়।

এরপর তাক্বওয়ার অনুসঙ্গ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি (আ.)বলেন, তাক্বওয়ার বহু অনুসঙ্গ রয়েছে, যেমন আত্মশ্লাঘা, আত্মম্ভরিতা, অহংকার অর্থাৎ নিজের প্রশংসা করা ও আত্মপ্রচারণা। তাক্বওয়া হলো আত্মশ্লাঘা, আত্মম্ভরিতা,অবৈধ সম্পদ এবং দুঃশ্চরিত্র এড়িয়ে চলা,অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা। যে ব্যক্তি ভালো চারিত্রিক গুণাবলী প্রদর্শন করে শত্রুও তার মিত্র হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ

(সূরা হা মীম আস্ সাজদা: ৩৫)।

একটু চিন্তা কর! এই হিদায়াত কোন পথের দিশা দেয়। এর পিছনে আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য হল, বিরোধীরা যদি গালিও দেয় তবুও প্রত্যুত্তরে গালি না দেয়া বরং ধৈর্য ধারণ করা । এর ফলাফল যা হবে তাহলো বিরোধীরা তোমাদের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী হয়ে নিজেরাই লজ্জিত হবে এবং অনুশোচনা করবে। আর এই শাস্তি সেই শাস্তির চেয়ে অনেক মহান হবে যা প্রতিশোধমূলক ভাবে তুমি তাকে দিতে পার। এমনিতে সামান্য ব্যক্তিও এমন প্রদক্ষেপ নিতে পারে যা হত্যায় পর্যবসিত হতে পারে কিন্তু মানবতা এবং তাক্বওয়ার দাবি এটি নয়। নৈতিক সৌন্দর্য এমন একটি বৈশিষ্ট্য যে, চরম ক্ষতিকর ব্যক্তি বা শত্রুর ওপরও এর খুবই ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। কোন ব্যক্তি কতই না সুন্দর কথা বলেছেন, 'লুতফ্ কুন লুতফ্ কেহ্ বেগানাহ্ শওয়াদ হালকা বেগোশ'অর্থাৎ মানুষের প্রতি সদয় হও যেন পরও আপন হয়ে যায়।

মানুষের পুণ্য এবং তাক্বওয়ার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত, এ বিষয়েআলোকপাত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, আসল কথা হল,মানুষের পুণ্য এবং তাক্বওয়ার প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিত এবং পুণ্যের পথ অবলম্বন করা উচিত। তাহলেই কিছু হওয়া সম্ভব।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ

(সূরা আর্-রা'দ: ১২)। 'আল্লাহ্ তা'লা কোন জাতির অবস্থায় ততক্ষণ পরিবর্তন আনেন না যতক্ষণ সেই জাতি নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে।' অনর্থক বাজে ধারণা পোষণ করা এবং তুল কালাম কাণ্ড ঘটিয়ে বসা এটি খুবইঅশোভন কাজ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, খোদার প্রতি মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, নামায পড়া, যাকাত দেয়া, অন্যের অধিকার খর্ব না করা এবং অপকর্ম ও নোংরা কর্ম থেকে বিরত থাকা। এটি প্রমাণিত সত্য যে, অনেক সময় একজনের অপকর্মে পুরো ঘর এবং গোটা শহর ধ্বংসের শিকার হয়।তাই পাপ পরিহার কর, তা ধ্বংস ডেকে আনে। যদি তোমাদের প্রতিবেশি কুধারণা পোষণ করে তাহলে তার কুধারণা দূরীভূত করার চেষ্টা কর এবং তাকে বুঝাও। মানুষ আর কত দিন ঔদাসীন্য প্রদর্শন করবে? হাদীসে এসেছে, সমস্যা আসার পূর্বে যে দোয়া করা হয় সেটিই গৃহীত হয়। কেননা, ভয়-ভীতির মুখে প্রত্যেক ব্যক্তিই দোয়া

করতে পারে আর আল্লাহ্‌মুখী হতে পারে। সৌভাগ্যের বিষয় হল, শান্তির সময় দোয়া করা। অতএব এদিকেই আমাদের কর্ণপাত করা উচিত বা মনোযোগ দেয়া উচিত।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, আসল কথা হল, তাক্বওয়ার প্রভাব এবং প্রতাপ অন্যদের ওপরও পড়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীদের কখনও ধ্বংস করেন না। আমি একগ্রন্থে পড়েছি, হযরত শেখ আব্দুল কাদের জিলানী সাহেব (রাহে.) নামে অনেক বড় একজন পুণ্যবান অতিবাহিত হয়েছেন, তিনি খুবই পবিত্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর মা'কে বলেন, আমি দুনিয়ার প্রতি বিতশ্রদ্ধ। কোন আধ্যাত্মিক নেতার সন্ধান করতে চাই, যিনি আমাকে প্রশান্তি এবং আধ্যাত্মিকতার পথ প্রদর্শন করবেন। মা যখন দেখেন, সে এখন আর আমাদের কোন কাজের নয় তখন তার কথা গ্রহণ করেন আর বলেন, ঠিক আছে তোমাকে বিদায় দিচ্ছি, এই বলে তিনি গৃহাভ্যন্তরেগিয়ে সঞ্চিত ৮০টি মুদ্রা নিয়ে আসেন এবং বলেন, শরীয়ত অনুসারে এই মুদ্রার ৪০টি আশরাফী বা মুদ্রা তোমার আর ৪০টি তোমার বড় ভাই-এর। তাই ৪০টি আশরাফী বা মুদ্রা প্রাপ্য অংশ হিসেবে আমি তোমাকে দিচ্ছি। এটি বলে সেই ৪০টি মুদ্রা তার জামার বগলের নীচে কামিয বা জামায় সেলাই করে রেখে দেন আর বলেন, নিরাপদ স্থানে গিয়ে তা বের করে নিও এবং প্রয়োজনে খরচ কর। হযরত সৈয়্যদ আব্দুল কাদের জিলানী সাহেব মাকে বলেন, আমি সফরে বের হচ্ছি, আমাকে কোন নসীহত করুন।

মা বলেন, হে আমার পুত্র! কখনও মিথ্যা বলবে না, এই হল, তোমার জন্য নসীহত। একথা সব সময় স্মরণ রাখবে, এর ফলে তুমি প্রভূত কল্যাণের অধিকারী হবে। একথা শুনে তিনি বিদায় নেন। দৈবক্রমে যা ঘটে তাহলো, যাত্রাপথে তিনি যে জঙ্গল অতিক্রম করছিলেন সেই জঙ্গলে কিছু ডাকাত বা চোরের বসতি ছিল যারা পথিকদের ধনসম্পদলুট-পাট করত। দূর থেকে সৈয়্যদ আব্দুল কাদের জিলানী সাহেবের ওপর তাদের চোখ পড়ে। কাছে এসে তারা এক কম্বল পরিহিত ফকিরকে দেখতে পেয়ে হাসি ঠাট্টাচ্ছলে জিজ্ঞেস করে,তোর কাছে কিছু আছে কী? তিনি সদ্য মায়ের নসীহত শুনে এসেছিলেন যে, মিথ্যা বলবে না, তাই তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর দেন, হ্যাঁ, ৪০টি মুদ্রা আমার বগলের নিচে রয়েছে যা আমার মা থলি বা জেবের মত করে সিলিয়ে দিয়েছেন। সেই চোর মনে করে যে, এ ঠাট্টা করছে, দ্বিতীয় চোর জিজ্ঞেস করলে তাকেও তিনি একই উত্তর দেন। এক কথায় প্রত্যেক চোরকে তিনি একই উত্তর প্রদান করেন। তারা তাকে চোরদের দলনেতা বা বড় চোরের কাছে নিয়ে গিয়ে বলে, এ বার বার বলছে তার কাছে এতটি মুদ্রা আছে। তখন নেতা বলে, তার কাপড়ে খুঁজে দেখ, তল্লাশীর পর বাস্তবেই ৪০টি মুদ্রা পাওয়া যায়। সে আশ্চর্য হয় যে, এ তো অদ্ভুত মানুষ, এমন মানুষ আমরা কখনও দেখি নি। চোরদের নেতা জিজ্ঞেস করে, কারণ কী যে, তুমি এইভাবে আমাদেরকে তোমার অর্থের সন্ধান দিলে। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র ধর্মের সন্ধানে বা জ্ঞানের সন্ধানে বের হয়েছি, যাত্রার সময় মা নসীহত করেছেন, কখনও মিথ্যা বলবে না। এটি আমার প্রথম পরীক্ষা ছিল তাই আমি কেন মিথ্যা বলব। একথা শুনে সেই চোরদের নেতা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে যে, হায়! আমি একবারও আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মানলাম না, সে চোরদের সম্বোধন করে বলে, এই ব্যক্তির কথা এবং অবিচলতা আমার কার্য সাঙ্গ করেছে, তোমাদের সাথে আমি আর থাকতে পারি না, আমি তওবা করছি, তার এ কথা বলার পর বাকী চোররাও তওবা করে।

অতএব এ কথা আত্মজিজ্ঞাসার প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করে। আমরাও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে এ জন্য মেনেছি যে, ধর্ম বিকৃতির শিকার হয়েছে। সঠিক ইসলামী শিক্ষার ওপর কেউ প্রতিষ্ঠিত নয়, সেই শিক্ষা অনুসারে কেউ জীবন যাপন করছে না, যদি ইসলামের সঠিক শিক্ষার ওপর চলতে হয় তাহলে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মান, আর এ কারণেই আমরা মেনেছি। এখন প্রশ্ন হল, আমরা কি এরপর পাপ পরিত্যাগ করেছি? মিথ্যা এমন এক ব্যাধি যা বাহ্যতঃ সামান্য বিষয় মনে হয় কিন্তুএটি অনেক বড় পাপ। এই ঘটনার মানদণ্ডে আমরা যদি যাচাই করি তাহলে অধিকাংশ মানুষ নিজেদেরকে এই পাপে লিপ্ত পাবে। অতএব বয়আত এবং তাক্বওয়ার দাবি হল, এই পাপ থেকে বিরত থাকা। এসব দেশে যারা আসে তাদের অনেকেই এমন আছে যারা একান্ত ধর্মীয় কারণে এসেছেন, ধর্মীয় কারণে বহিষ্কৃত হয়েছেন, স্বদেশে তাদের জন্যধর্ম লালন-পালন সম্ভব ছিল না, স্বাধীনভাবে ধর্মমত প্রকাশের সুযোগ ছিল না, তাই আমাদের বিশেষ করে যারা পাশ্চাত্যে বসবাস করে তাদের অনেক বেশি সাবধান থাকা উচিত। আমাদের সামান্যতম কোন কাজও যেন এমন না হয় যা থেকে এমন কথার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বা এমন কোন কথা যেন মুখ থেকে বের না হয় যা মিথ্যা গণ্য হতে পারে বা কোন অন্যায় সুযোগ যেন আমরা না নেই, মিথ্যার মাধ্যমে বা মিথ্যার ভিত্তিতে কোন অন্যায় সুযোগ সুবিধা যেন আমরা না নেই। অতএব তাক্বওয়ার মাপকাঠিতে সবার আত্মসমালোচনা বা আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত বা নিজের অবস্থান খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি-বৃত্তি কীভাবে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে ব্যবহার করা যায় আর ন্যায়সঙ্গত ভাবে ব্যবহার করলেই মানুষের উন্নতি হয় এ সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা শক্তি-বৃত্তি দিয়েছেন তা নষ্ট করার জন্য দেন নি, সেগুলোকে ভারসাম্যপূর্ণ এবং যথাযথভাবে ব্যবহার করার মাঝেই এর উন্নতি নিহিত। এগুলোর বৃদ্ধি, এগুলোকে কাজে লাগানো এবং ভাল রাখতে হলে এর বৈধ ব্যবহার আবশ্যক। এ কারণেই ইসলাম পুরুষত্ব নষ্ট করা বা চোখ উৎপাটনের শিক্ষা দেয়নি বরং এগুলোর বৈধ ব্যবহারকে আত্মশুদ্ধির কারণ আখ্যায়িত করেছে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কাদ আফলাহাল মু'মিনুন' (সূরা আল্-মু'মিনূন: ০২)।

এরপর মুত্তাকীর জীবনচিত্র অংকন করে শেষের দিকে উপসংহারস্বরূপ বলেন, 'ফা উলাইকা হুমুল মুফলিহুন' (সূরা আল্-মু'মিনূন: ১০৩) অর্থাৎ এমন মানুষ যারা তাক্বওয়ার পথে পদচারণা করে, অদৃশ্যে বিশ্বাস রাখে, নামায দোদুল্যমান হলে নামাযকে পুনরায় দণ্ডায়মান করে, খোদা প্রদত্ত সম্পদ থেকে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে, যখন ইবাদত করে আর বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা মাথাচাড়া দেয় তখন পুনরায় খোদার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করে, সেই সমস্ত চিন্তা-ধারাকে ঝেড়ে ফেলে।অনেক সময় নামাযের প্রতি মনোযোগ থাকে না যে, যথা সময়ে নামায পড়তে হবে, কিন্তু এরা আবার নিজেদের সংশোধন করে, সময় মত নামায পড়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে, এমন মানুষই সফলকাম হয় এবং খোদা প্রদত্ত রিয্ক থেকে তারা খরচ করে। রিপুর তাড়না সত্ত্বেও বিনা বাক্য ব্যয়ে অতীত ও বর্তমান গ্রন্থে ঈমান আনে। অবশেষে সেই বিশ্বাসের পর্যায়ে তারা পৌঁছে যায়। অদৃশ্যে ঈমান থাকলে তারা বিশ্বাসে উপনীত হয়, এমন ঈমান সৃষ্টি হয় যা দৃঢ় বিশ্বাসের পর্যায়ে

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, জেলখানার রিপোর্টে এ সংক্রান্ত সংবাদ পড়ে আমি যারপরনাই মর্মাহত হই যখন আমি দেখি যে, মুসলমানরা অপকর্মের কারণে এভাবে শাস্তি পেয়েছে। আমার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে যায় যে, এরা যারা সঠিক-সরল বা সত্য ধর্মের অনুসারী তারা নিজেদের ভারসাম্যহীনতার কারণে শুধু নিজেদেরই দুর্নাম করে না বরং ইসলামকেও হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করে। তিনি (আ.) বলেন, আমার কথার উদ্দেশ্য হল, তারা মুসলমান আখ্যায়িত হয়েও এমন নিষিদ্ধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয় যা শুধু তাদেরকেই নয় বরং ইসলামকেও সন্দেহ যুক্ত করে তুলে। তিনি (আ.) বলেন, অতএব নিজেদের চাল-চলন এবং আচার-আচরণ এমন বানাও যেন অবিশ্বাসীরাও তোমাদের সম্পর্কে সমালোচনার কোন সুযোগ না পায়, যা সত্যিকার অর্থে ইসলামের ওপরই বর্তায়।

পৌঁছায়। এমন মানুষই হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা এমন এক পথে প্রতিষ্ঠিত যা ক্রমশঃঅগ্রসরমান, যার মাধ্যমে মানুষ সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়, এরাই সফল, যারা গন্তব্যে পৌঁছে যাবে আর পথের বিপদাপদ থেকে মুক্তি পাবে। সেকারণেই আল্লাহ্ তা'লা প্রারম্ভেই তাক্বওয়ার শিক্ষা দিয়ে এমন এক গ্রন্থ আমাদের দান করেছেন যাতে তাক্বওয়া সংক্রান্ত ওসীয়্যত এবং নসীহতও করেছেন। সুতরাং আমাদের জামাতের সদস্যদের হৃদয়ে সমস্ত জাগতিক চিন্তার চেয়ে এই চিন্তা অগ্রগণ্য হওয়া উচিত যে, তাদের মাঝে তাক্বওয়া আছে কি না?

এরপর খোদা ভীতি সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, খোদাভীতি যাতে নিহিত তাহলো মানুষের এটি দেখা যে, তার কথা এবং কর্মে কতটা সামাঞ্জস্য রয়েছে? কথা কি বলছে আর কাজ কি করছে, কোন সামাঞ্জস্য আছে কি-না অর্থাৎ একটির সাথে অন্যটির সামাঞ্জস্য আছে কি না।যদি দেখে, তার কথা এবং কর্মের সামাঞ্জস্য নেই তাহলে সে নিশ্চিত হতে পারে যে, সে খোদার ক্রোধভাজন হবে। যে হৃদয় অপবিত্র তার কথা যতই পবিত্র হোক না কেন সে হৃদয় আল্লাহ্‌র কাছে কোন মূল্য রাখে না। হৃদয় যদি নোংরা হয়, কর্ম যদি কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাহলে যত নেক কথাই আমরা বলি না কেন খোদার দৃষ্টিতে এর কোন মূল্য নেই বরং খোদার ক্রোধকেই সে আমন্ত্রণ জানাবে। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এ থেকে রক্ষা করুন। অতএব আমার জামাতের জানা উচিত যে, তারা আমার কাছে বীজ গ্রহণের জন্য বাবীজতলা হিসেবে এসেছে যার ফলে তারা এক ফলবাহী বৃক্ষে পরিণত হবে। তাই সবার নিজের জীবন সম্পর্কে ভাবা উচিত যে, তার ভেতর কেমন আর বাইর কেমন।

যদি আমাদের জামাতও আল্লাহ্ না করুন এমন হয়ে থাকে যাদের মুখে কিছু আর হৃদয়ে ভিন্ন কিছু তাহলে এর পরিণাম শুভ হবে না। আল্লাহ্ তা'লা যখন দেখেন, এক জামাতের হৃদয় খালি আর মুখে বড় বড় দবুলি তাদের জানা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা পরবিমুখ বা অমুখাপেক্ষী। বদরে বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, সকল অর্থে বিজয়ের আশা ছিল, আল্লাহ্ তা'লা বলেছিলেন, বিজয় দান করব, কিন্তু তাসত্ত্বেও মহানবী (সা.) কেঁদে কেঁদে দোয়া করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বলেন, সকল অর্থে যেখানে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি রয়েছে সেখানে এত বিগলিত চিত্তে ক্রন্দনের প্রয়োজন কী? মহানবী (সা.) বলেন, খোদা তা'লা গণী বা অমুখাপেক্ষী, হয়ত খোদার প্রতিশ্রুতিতে কোন গোপন শর্তথাকবে। তাই আমাদের জন্য বড় ভয়ের বিষয়, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে উন্নতি এবং বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু সেই জয়যাত্রার অংশ হওয়ার জন্য আমাদের আত্মাজিজ্ঞাসার প্রয়োজন রয়েছে।

তিনি (আ.) আরো বলেন, আমাদের জামাতের জন্য বিশেষভাবে তাক্বওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষত এই দৃষ্টিকোণ থেকেও যে, তারা এমন এক ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখে বা তাঁর জামাতভুক্ত যিনি প্রত্যাদৃষ্ট হওয়ার দাবি করেছেন, যেন এমন মানুষ যারা কোন প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ বা শির্‌কে লিপ্ত ছিল বা যেমন জগতমুখিতাই হোক কেন তা থেকে মুক্তি পেতে পারে। বিভিন্ন পুরনো ব্যাধি ছিল কিন্তু এখন এমন এক ব্যক্তির প্রতি আরোপিত হচ্ছে যিনি প্রত্যাদৃষ্ট হওয়ার দাবি করেছেন। আপনারা তাঁর সাথে সম্পর্কের দাবি করেছেন যেন এই সমস্ত বিষয় এবং সমস্যাবলি থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন।

তিনি (আ.) বলেন, আপনারা জানেন যে, কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, তার অসুস্থতা বড় হোক বা ছোট এর জন্য যদি চিকিৎসা না করা হয় আর চিকিৎসার কষ্ট সহ্য না করা হয় তাহলে রোগ নিরাময় হতে পারে না। মুখে একটা কালো দাগ বের হলে মহা দুঃশ্চিন্তার কারণ হয়, কোথাও এ দাগ সম্প্রসারিত হয়ে সারা মুখে না ছড়িয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে গুনাহ্ বা পাপেরও একটি দাগ রয়েছে যা হৃদয়ের ওপর পড়ে। ছোট পাপই ঔদাসীন্য, ভ্রুক্ষেপহীনতা ও আরামপ্রিয়তার কারণে গুনাহে কবীরায় পর্যবসিত হয়। মানুষ মনে করে সামান্য বিষয়, ভ্রুক্ষেপ করে না, আলস্য প্রদর্শন করে, এর সুরাহার ক্ষেত্রে পুরোপুরি আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করে না, তা থেকে বিরত থাকার জন্য খোদার তাক্বওয়া অবলম্বন করে না, এই আলস্যই অবশেষে বড় পাপে পর্যবসিত হয়। ছোট গুনাহ্ সেই ছোট দাগই যা সম্প্রসারিত হয়ে অবশেষে পুরো মুখকে কালো করে ফেলে। ছোট পাপই বড় পাপে পর্যবসিত হয় এবং আপাদমস্তক মানুষ কালিমালিপ্ত হয়ে যায়।

রমযানের এই বিশেষ পরিবেশে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর নির্দেশ অনুসারে তাক্বওয়া অবলম্বনের তৌফিক দিন। আর আমরা যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামাতের সেই সদস্য হতে পারি যারা সকল প্রকার পাপ থেকে বিরত থাকবে এবং নিজেদের প্রতিটি কাজকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অধিনস্ত করবে। আর

এই মাস থেকে আমরা যেন এমনভাবে পবিত্র হয়ে বের হই আর পুণ্যের ওপর এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হই যেন আমাদের ছুটে যাওয়া পাপ এবং দুর্বলতা পুনরায় ফিরে আসতে না পারে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর দুই ব্যক্তির জানাযা পড়াব। একটি হাযের জানাযা যা যুক্তরাজ্যের কভেন্ট্রি নিবাসী শ্রদ্ধেয়া তাহেরা হামীদ সাহেবার। স্বামীর নাম আব্দুল হামীদ মরহুম । গত ৮ জুন দীর্ঘ অসুস্থতার পর ৬০ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তার ছিল সম্পর্ক পাকিস্তানের জেহলামের সাথে, ২০০১ সনে যুক্তরাজ্যে আসেন। পুণ্যবতী, নামাযে অভ্যস্ত ও খিলাফতের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতেন, বাচ্চাদের সঠিক তরবীয়ত করেছেন, সন্তান-সন্ততিকে জামাতের সাথে সম্পৃক্ত রেখেছেন, বিশেষ করে নামাযের প্রতি যত্নশীলা। আল্লাহ্‌র কৃপায়তিনি মূসীয়া ছিলেন। তার আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে মা ছাড়াও এক পুত্র এবং পাঁচ কন্যা রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর রূহের মাগফিরাত করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য দান করুন।

দ্বিতীয়টি হল, গায়েবানা জানাযা যা আটকের জনাব হামীদ আহমদ শহীদের, পিতার নাম শরীফ আহমদ। তার বয়স ছিল ৬৩, আটকেই বসবাস করতেন। জামাতের বিরোধীরা গত ৪ জুন দুপুর আড়াইটার সময় তার ঘরের বাহিরে গুলি করে তাকে শহীদ করে, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ অনুসারে ৪ জুন জনাব হামীদ সাহেব নামাযে যোহর পড়ে মসজিদ থেকে ঘরে ফিরে আসেন, ঘরের গেইটে এসে মটর সাইকেলের হর্ণ বাজান, তার কন্যা বাহিরের গেইট খোলার জন্য আসছিলেন, তখনই অজ্ঞাত পরিচয় আক্রমণকারীরা আসে এবং হামীদ সাহেবকে লক্ষ্য করে খুব কাছ থেকে গুলি করে পালিয়ে যায়। হামীদ সাহেবের মুখের ডান দিকে একটি বুলেট লাগে এবং বাম দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। গুলি বিদ্ধ হওয়ার ফলে তিনি ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

তার বংশে আহমদীয়াত আসে তার দাদা জনাব মিঞাঁ মোহাম্মদ আলী সাহেবের মাধ্যমে, যিনি গুজরানওয়ালা নিবাসী ছিলেন। ১৯২৩ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর পবিত্র হাতে তিনি বয়আত করেছিলেন। শহীদ মরহুম ১৯৫৩ সনের ১৫ মে, গুজরানওয়ালার লাভেরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। সেখানেই তিনি উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। এরপর আটকে সানজুয়াল ফ্যাক্টরীতে তিনি চাকরী গ্রহণ করেন। চাকরীর পাশপাশি তিনি গ্র্যাজুয়েশন করেন আর একইসাথে ডিএইচএমএস-এর কোর্সও সম্পন্ন করেন, হোমিও প্র্যাক্টিসও করতেন। ২৬ বছর চাকরী করার পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এরপর আটক শহরে হোমিও ক্লিনিক খুলেন। ১৯৮২ সনে শ্রদ্ধেয়া আমাতুল করীম সাহেবার সাথে তার বিয়ে হয়। রাবওয়া নিবাসী তার শ্বশুরের নাম হল, বশীর আহমদ সাহেব। রাবওয়া ক্লথ ষ্টোর হিসেবে তার দোকান প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁর স্ত্রী ৪ বছর পূর্বে ইন্তকাল করেন, অসুস্থ ছিলেন। আটকের সরকারী কলেজের লেকচারার হিসেবে তিনি চাকরী করতেন। শহীদ মরহুম বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। তবলীগ, আতিথেয়তা, মানুষের প্রতি সহানুভূতি, দরিদ্রদের সাহায্য করা, ওহদাদারদের বা জামাতের কর্মকর্তাদের আনুগত্য তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। খুবই কর্মঠ ও সক্রিয় দাঈইলাল্লাহ্ ছিলেন। আবশ্যকীয় চাঁদা ছাড়াও অন্যান্য আর্থিক কুরবানীতে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। সানজুয়াল ফ্যাক্টরীতে চাকরীকালে তার এক সহকর্মীকে বয়আত করান এরপর সেই ব্যক্তির পুরো পরিবার আহমদীয়াত গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে আরেক পরিবারের ৯ জন আহমদীয়াত গ্রহণ করেন (তার মাধ্যমে)।

এই কারণে ফ্যাক্টরীতে তার বিরোধিতা আরম্ভ হয়। শহীদ মরহুম সরকারের পক্ষ থেকে বরাদ্দকৃত ফ্ল্যাটে থাকতেন। বিরোধীরা তার ঘরে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। অবশেষে ফ্যাক্টরীর ব্যবস্থাপকরা হামীদ সাহেব এবং তার নতুন বয়আতকারী সহকর্মীকে সানজুয়াল থেকে রাওয়ালপিন্ডির ওয়াহ্ ফ্যাক্টরীতে বদলী করেন। শহীদ মরহুম বেশ কিছু দিন থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন ছিলেন। ২০১৫ সনের জানুয়ারি মাসে এক দুস্কৃতকারী আটকের মসজিদ এবং তার ক্লিনিকে অগ্নি সংযোগের চেষ্টা করে। যাহোক, যথা সময়ে পাহারাদার আসার কারণে সেই ব্যক্তি পালিয়ে যায়। এ ঘটনার দু'দিন পর সেই দুস্কৃতকারী তার ক্লিনিকে অগ্নি সংযোগের চেষ্টা করে এবং ঘটনাস্থলেই ধরা পড়ে, তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়। তার পুত্র নাভিদ আহমদ সাহেব এখানেই আছেন, তিনি পিতার জানাযায় যেতে পারেন নি। তিনি বলেন, আমার পিতা খিলাফতের আনুগত্যশীল একজন মানুষ ছিলেন, খুবই সাহসী ছিলেন, তবলীগ করতেন, পাঁচ বেলার নামায নিজেও পড়তেন আর আমাদেরও নসীহত করতেন, প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং তিলাওয়াত করার নির্দেশ দিতেন। এখানেও তিনি বেশ কয়েকবার জলসায় এসেছেন। সব সময় মসজিদ ফযলে এসে বাজামাত নামায পড়ার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতেন। তার ছোট কন্যা সালমা নুজহাত বলেন, আমাদের পিতা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিতেন, সব তাহরীকে আগ্রহভরে সাড়া দিতেন। শাহাদাতের প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে তিনি বলেছিলেন, হে আমার কন্যা! জীবনের কোন ভরসা নেই, আর সব সময় পুণ্যের বা সৎকর্মেরও নসীহত করতেন। তার এক কন্যার নাম হল, ফাসাহাত হামীদ সাহেবা, তিনি বলেন, লন্ডন থেকে অডিও খুতবা যা আসত তা রেকর্ড করে তিনি বন্ধুদেরকে whatsapp-এ পাঠাতেন।

তার দ্বিতীয় পুত্রের নাম হল, সাঈদ আহমদ সাহেব, তারও একই ভাষ্য। একই গুণাবলীর কথা সবাই লিখেছেন যে, অত্যন্ত নেক, পুণ্যের নসীহতকারী, সৎসাহসী, তবলীগকারী ছিলেন। পাকিস্তানের পরিবেশে তবলীগ করা খুব কঠিন কাজ। মরহুম আমাদের প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিসে কর্মরত যহুর সাহেবের ভগ্নিপতি ছিলেন। তিনিও লিখেছেন, জামাতি দায়িত্ব বড় কষ্ট সহ্য করে সততার সাথে পালন করতেন। যত বেশি সম্ভব হত সময় বের করে খিদমতের বা জামাতের কাজ করার চেষ্টা করতেন, সব তাহরীকে অংশ নিতেন, সন্তান-সন্ততিকে জামাতের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার নসীহত করতেন, তাহাজ্জুদ গুযার এবং নেক ছিলেন, দীর্ঘ দোয়ায় রত থাকতেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তান-সন্ততির হাফেয এবং নাসের হোন, সেখানে তার সন্তানদেরও প্রাণের আশঙ্কা রয়েছে। আল্লাহ তা'লা তাদেরকে স্বীয় নিরাপত্তার বেষ্টনীতে স্থান দিন এবং পিতার পুণ্যকে ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

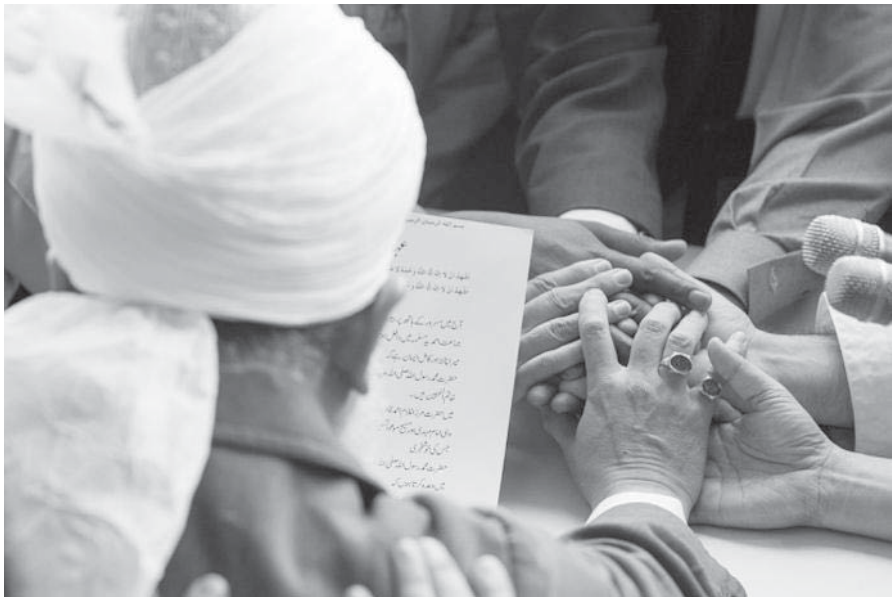

বয়আতের শর্তসমূহ এবং একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

তাহাজ্জুদ নামায নিয়মিত পড়ো

বয়আতের তৃতীয় শর্তে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۝

(সূরা বনী ইসরাইল, ১৭:৮০)

অর্থাৎ, সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে শুরু করে রাতের আধার ঘনিয়ে আসা পর্যন্ত নামায প্রতিষ্ঠিত করো আর ফজরের সময় তিলাওয়াত করাকে গুরুত্ব প্রদান করো। ফজরে কুরআন পাঠ নিশ্চয়ই এমন যে তা সাক্ষ্য প্রদান করে থাকে, আর নিশুতিকালের এক অংশেও তার (কুরান পাঠের) সাথে তাহাজ্জুদ (নামায) পড়তে থাকো। এটা তোমাদের জন্য হবে নফল বিশেষ। শীঘ্রই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদেরকে 'মাক্বামে মাহমুদ'-এ অধিষ্ঠিত করে দেবেন।

হযরত বেলাল (রাযি.) বর্ণনা করেছেন– আঁ হযরত (সা.) বলেছেন,তাহাজ্জুদ নামায তোমাদের নিয়মিতভাবে পড়া উচিত, কেননা এটা অতীতকালের সৎকর্মশীলদের পদ্ধতি ছিল এবং স্রষ্টার নৈকট্য লাভের মাধ্যম। এই অভ্যাস পাপকর্ম থেকে বিরত রাখে, মন্দকর্ম দূর করে আর শারীরিক রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা করে। [তিরমিযি, আবওয়াবুদ্ দাওয়াত]

অপর একটি হাদীস রয়েছে:

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, রাতে শেষ প্রহর যখন আসে আল্লাহ্ তা'লা তখন পৃথিবী সকাশে অবতরণ করেন আর বলেন, আছে কী কেউ? যে আমার কাছে দোয়া (যাচনা) করবে আর আমি তার দোয়া কবুল করবো। কেউ কী আছে? যে আমার কাছে ক্ষমা প্রর্থনা করবে আর আমি তাকে মার্জনা করবো। কেউ কী আছে? যে তার নিজের দুঃখ-ক্লেশ দূর করার জন্য দোয়া করলে আমি দুঃখ-ক্লেশ বিদূরিত করবো। এভাবে আল্লাহ্ তা'লার এই আহ্বান করা (ততক্ষণ পর্যন্ত) চলতেই থাকে এমন কি সুবেহ সাদেক-প্রভাতের আলোক রেখা ফুটে ওঠে। [মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, পৃ. ৫২১, বৈরুতে মুদ্রিত]

অনেকেই দোয়ার জন্য লিখে থাকেন। নিজেরাও এ পদ্ধতির ওপর আমল করে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের বারিবর্ষণ হওয়া দেখুন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন– আঁ হযরত (সা.) এক প্রসঙ্গে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন–যে আমার দোস্তের সাথে দুশমনি করেছে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। আমার বান্দা, যতটা আমার নৈকট্য, যা কিছু আমার পসন্দ আর আমি (যেসব) তাদের জন্য ফরয করে দিয়েছি, তা থেকে লাভ করতে সক্ষম হবে, ততটা অন্য আর কিছু থেকে লাভ করতে পারবে না। নফলের মাধ্যমে আমার বান্দা আমার আরো এমন নিকটতর হয়ে যায় যে, আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করে দিই। আর আমি তাকে যখন নিজের দোস্ত বানিয়ে নিই তখন তার কান হয়ে যাই যদ্বারা সে শুনে, চোখ বনে যাই যদ্বারা সে দেখে, তার হাতে পরিণত হই যদ্বারা সে ধরে রাখে, তার পা হয়ে যাই যদ্বারা সে চলা-ফেরা করে, অর্থাৎ আমি-ই তার রূপকার-নির্মাতা। আমার কাছে চাইলেই আমি তাকে দিই, সে আমার কাছে আশ্রয় যাচনা করলে আমি তাঁকে নিরাপদ আশ্রয় দান করি। [বুখারী, কিতাবুর রক্বাক্ব বাব আত্ তওয়াযা']

হযরত আবু হুরায়ারা (রাযি.) আরও বর্ণনা করেন– আঁ হযরত (সা.) বলেন, সেই ব্যক্তিরও ওপর আল্লাহ্ তা'লা রহম করুন, যে রাতের বেলায় জেগে ওঠে ও নামায পড়ে আর প্রিয়তমা স্ত্রীকে জাগিয়ে দেয়। সে (স্ত্রী) জেগে ওঠতে গড়িমসি করলে তার মুখমন্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয় যাতে সজাগ হয়ে সে ওঠে পড়ে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা সেই মহিলার প্রতিও রহম করুন, রাতকালে যে জেগে ওঠে, নামায পড়ে আর প্রিয়তম স্বামীকেও জাগিয়ে তুলে। স্বামী জেগে ওঠতে গড়িমসি করলে তার মুখমন্ডলে পানি

ছিটিয়ে দেয়, যাতে সে জেগে ওঠে। [আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত]

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন:

"তাহাজ্জুদের নামাযকে আমাদের জামা'ত-এর অবশ্য পালনীয় রূপে গ্রহণ করে নেয়া উচিত। যারা বেশী পারে না তারা না হয় দু'রাকাত-ই পড়ে নিক, কেননা এতে তাদের অন্তত: দোয়া করবার সুযোগ তো লাভ হবে। সেই সময়ের দোয়াতে এক প্রভাব থাকে কারণ প্রকৃতই তখন মায়া-মমতা ও আবেগের সাথে তা উৎসারিত হয়।

যতক্ষণ কারো অন্তরে এক বিশেষ আবেগ ও মর্মবেদনা অনুভূত না হচ্ছে ততক্ষণ তার কায়-ক্লেশ কী করে কেটে উঠতে পারে? অতএব, সেই সময়ে জেগে ওঠাটাই এক মর্মবেদনা সৃষ্টি করে দেয়, যা দোয়াতে বিনম্র কোমলতা ও উদ্বেগাপূর্ণ আকুলতা সৃষ্টি করে আর এই উদ্বেগাকুল অস্থিরতা দোয়া গ্রহণীয় হওয়ার কারণে পরিণত হয়। কিন্তু জেগে ওঠায় যদি দুর্বলতা ও উদাসীনতা দেখা যায় তবে তো এটাই প্রকাশ পায় যে হৃদয়ে সেই মর্ম-যাতনা নেই, কেননা ঘুম ও নিদ্রা তো মর্ম-বেদনা লাঘব করে দেয়। কিন্তু ঘুমহীন রাত যখন কাটে তখন বুঝা যায় যে মর্মপীড়ার কষ্টকর কোন যাতনা নিদ্রার চেয়েও শক্তিশালী হয়ে চেপে রয়েছে, যা ঘুম থেকে জাগিয়ে রাখছে"। [মালফুযাত, ২য় খন্ড, পৃ. ১৮২, নব সংস্করণ]

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেছেন:

"রাতে জেগে ওঠো! আর যাচনা করো যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে তাঁর হেদায়াতের পথ দেখান। আঁ হযরত (সা.)-এর সাহাবাগণও পর্যায়ক্রমে তরবীয়্যত (প্রশিক্ষণ) লাভ করেছেন। পূর্বে কী ছিল তারা! এক কৃষকের চাষের জমিতে বীজ বপন করার ন্যায়, আঁ হযরত (সা.) জমিতে পানি দেয়ার মত তাতে সেচ প্রদান করলেন– তিনি (সা.) তাদের জন্য সকাতরে দোয়া করলেন। বীজ ছিল অঙ্কুরোদগমী আর জমিও ছিল উর্বরা তাই সেই পানি সিঞ্চনে ফলও ফললো সব বাহারী রকমের। হুযূর (সা.) যে পথে চলতেন তারাও সে পথ ধরেই চলতো, দিন বা রাতের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তারা করতো না। বিশুদ্ধ অন্তরে তোমরা তওবা (প্রত্যাবর্তন) করো, তাহাজ্জুদে ওঠো, দোয়া করো, সঠিকভাবে মনোনিবেশ করো, দুর্বলতা পরিহার করো আর খোদা তা'লা সন্তুষ্ট হোন তদনুযায়ী কথায় ও কাজে নিজেদেরকে সুসজ্জিত করো। [মালফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃ. ২৮ নব-সংস্করণ]

আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করা-কে স্থায়ী অবলম্বন করে নাও

বয়আতের এই তৃতীয় শর্তে আরও রয়েছে যে আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করবো, দরূদ পাঠে নিয়োজিত থাকবো আর এই দরূদ পাঠকে নিয়মিত অবলম্বন রূপে গ্রহণ করে নিবো। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন করীমে অল্লাহ্ তা'লা বলেন–

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٧﴾

(সূরা আল আহযাব, ৩৩:৫৭)

অর্থাৎ- নিশ্চয় আল্লাহ্ এবং তার ফিরিশ্‌তারা নবীর ওপর রহমত বর্ষণ করেন। হে লোক সকল! যারা ঈমান এনেছো তোমরাও তার ওপর দরূদ আর সালাম বেশী-বেশী করে প্রেরণ করো।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর ইবনুল আস (রাযি.) থেকে বর্ণনা রয়েছে যে তিনি হযরত নবী করীম (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, যখন তোমরা মুয়ায্যিনকে আযান দিতে শুনবে তখন উচ্চারিত ঐ বাক্যাবলী পুনরাবৃত্তি করো যা আযানে সে বলে, অতঃপর আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করো। যে ব্যাক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে আল্লাহ্ তা'লা দশগুণ পুণ্য তার ওপর অবতীর্ণ করবেন। তিনি (সা.) আরও বলেছেন– আল্লাহ্ তা'লার সকাশে আমার জন্য কল্যাণ যাচনা করো, যা জান্নাতের মর্যাদাপূর্ণ স্তরসমূহের মধ্যে এক মর্যাদাকর অবস্থান। আল্লাহ্ তা'লার বান্দাদের মধ্য থেকে কোন একজন, যে এটা লাভ করতে সক্ষম হবে, (আমি প্রত্যাশা রাখি যে আমি-ই হবো সেই ব্যক্তি আর সেই একজন), যে আমার জন্য আল্লাহ্ তা'লার সমীপে কল্যাণ যাচনা করেছে তার শাফাআ'ত লাভ করাটা বৈধতা পাবে। [সহী মুসলিম, কিতাবুস সালাত, বাব আন ক্বওলু মিসান ক্বওলু মুয়জ্জিন লামিনাশ সামাআহু সুম্মা ইউসাল্লি আলান্নাবীয়ে (সা.)]

অতএব, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি পাবার জন্য এই সবগুলো আঙ্গিক দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। খোদা পর্যন্ত পৌঁছুতে নিজের দোয়াকে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে কবুলিয়তের (গ্রহণীয়তার) দুয়ার আন্দোলিত করতে আবশ্যকীয় হলো আঁ হযরত (সা.)-এর মাধ্যম-মধ্যস্ততা, হাদীসে যেমনটি উল্লেখিত হয়েছে আর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-ও বলেছেন এটাই যে, অনেক বেশি সংখ্যায় দরূদ পাঠ করা উচিত।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আ'লা ইব্রাহিমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাক তা আ'লা ইব্রাহিমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।

হযরত আমর বিন রাবিআ' (রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন– যেই মুসলমান আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমার প্রতি দরূদ পাঠে রত থাকে ততক্ষণ নাগাদ ফিরিশ্‌তারা তার ওপর আশিষ বর্ষণ করে চলে। সেই দরূদ পাঠকারী তার ইচ্ছে মাফিক তা যত স্বল্পকালীন সময়ের জন্যই করুক বা যত বেশী সময় ধরেই করুক।

(চলবে)

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-৫৪)

(চ) মিথ্যা দাবীকারকের সমর্থনে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য–গ্রহণের প্রমাণ নেইঃ

প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রফেসর সালেহ মোহাম্মদ আলাদীন (ওসমানীয়া বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দ্রাবাদ, ভারত) লিখেছেনঃ

"প্রফেসর জি.এম. বল্লভ ও আমি এর আগে অন্য পঁচিশজন মাহদী দাবীকারকের যুগে রমযান মাসে সংঘটিত গ্রহণগুলোর তারিখ নিয়ে গবেষনা করে দেখেছি–এ তারিখগুলো পর্যবেক্ষনের স্থানের উপর নির্ভর করে। আমরা দাবীকারকদের এলাকা অনুসারে তারিখ নির্ধারণ করেছি। আমরা দেখেছি যে, কোনো দাবীকারক সম্পর্কে আমরা সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে, দাবী করার পর তাদের জীবদ্দশায়, তাদের নিজ অঞ্চল থেকে একই রমযান মাসের ১৩ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ এবং ২৮ তারিখে সূর্যগ্রহণ দেখা গেছে। (এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে দেখুনঃ আল–ফজল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, ১২জুন ১৯৯৮)। এছাড়া, আমাদের কাছে এমন কোনো দাবীকারকের সন্ধান নেই যিনি তার দাবীর সমর্থনে এই চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণকে পেশ করেছেন।

আলোচ্য প্রবন্ধে সালেহ বিন তারিফ, মির্যা আলী মুহাম্মদ বাব, হুসেইন আলী বাহাউল্লা, মাহদী সুদানী এবং ড. আলেকজান্ডার ডুই -এর নাম লেখক উল্লেখ করেছেন। লেখক লিখেছেন যে, এই ব্যক্তিরাও তাদের দাবীর সমর্থনে গ্রহণের নিদর্শন দাবী করতে পারতেন, কিন্তু তাদের কারো লেখা থেকেই এ সম্পর্কিত কোনো দাবীর প্রমান তিনি দেন নি।

উল্লিখিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমাদের হিসাব–নিকাশের ভিত্তিতে আমরা নিম্নের মন্তব্যগুলো করছিঃ

–সালেহ বিন তারিফ মাহদী দাবী করেছেন ১২৫ হিজরীতে এবং শাসন করেছেন ১৭৪ হিজরী পর্যন্ত। এই সময়ে (অর্থাৎ ১২৫-১৭৪ হিজরী) একই রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে ১২৬ হিজরীতে (৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে), ১২৭ হিজরীতে (৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে), ১৭০ হিজরীতে (৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে), এবং ১৭১ হিজরীতে (৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে)। দাবীকারকের অবস্থানস্থল মরক্কোর কথা মাথায় রেখে রমযান মাসে সংঘটিত গ্রহণ দুটির কথা আমরা বিবেচনা করেছি। আমরা দেখলাম, উক্ত বছরগুলোতে সংঘটিত কোনো সূর্যগ্রহণ মরক্কো থেকে দেখা যায় নি। চন্দ্রগ্রহণ দেখা গেছে ৭৪৫, ৭৬৬, ৭৮৭, এবং ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে।

–মির্যা আলী মোহাম্মদ বাব ১২৬৪ হিজরীতে (১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে) মাহদী দাবী করেছেন এবং তাকে হত্যা করা হয় ২৮ শাবান, ১২৬৬ হিজরী (৯ জুলাই, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ)। এই সময়কালে (অর্থাৎ ১৮৪৮-১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে) পৃথিবীর কোথাও কোনো চন্দ্রগ্রহণ কিংবা সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয় নি। [৪০]

(ছ) চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ দিকঃ

"আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ১৯৯৪ সালে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত মহানবী (সাঃ)–এর ভবিষ্যদ্বাণীটির পরিপূর্ণতার শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে। ৩১ জুলাই ১৯৯৪ জামা'তের তৎকালীন ইমাম (খলিফা) হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ) যুক্তরাজ্যে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত সুমহান ভবিষ্যদ্বাণী এবং এর আক্ষরিক পরিপূর্ণতা লাভের উপর এক আলোকিত ও প্রাঞ্জল বক্তৃতা করেন। তাঁর এই বক্তৃতা টিভিসহ বিভিন্ন মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে সম্প্রচারিত হয়। বক্তৃতায় তিনি (রাহে.) এই ভবিষ্যদ্বাণীটির নিম্নলিখিত পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেনঃ

১–চন্দ্রগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট রাতগুলোর মধ্যে প্রথম রাতে চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হতে হবে।

২–সূর্যগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট দিনগুলোর মধ্যে মধ্যম দিনে সূর্যগ্রহণ হতে হবে।

৩–এই গ্রহণ দুটি রমযান মাসে সংঘটিত হতে হবে।

৪–গ্রহণ দুটি সংঘটিত হওয়ার আগেই মাহদী হওয়ার দাবী করতে হবে। কারণ, এটা খুবই সম্ভব যে, গ্রহণদ্বয় সংঘটিত হওয়ার পর অনেকেই এগুলোকে নিজেদের পক্ষে দাবী করতে পারে এবং এর ফলে সঠিক ব্যক্তিকে শনাক্ত করাও সম্ভব হবে না।

৫–দাবীকারককেও এ নিদর্শন সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং তাঁর ঘোষণা করা উচিত হবে যে, আমিই সেই ইমাম মাহদী যার জন্য এই ঐশী নিদর্শনগুলো প্রকাশিত হয়েছে।

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ) বলেছেন, এ সংক্রান্ত সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করেও আমরা সত্য ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ছাড়া এমন কোনো মাহদী দাবীকারকের সন্ধান পাই নি যিনি চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণকে নিজের দাবীর সমর্থনে ঐশী নিদর্শন হিসেবে পেশ করেছেন।"[৪০]

[নোটঃ পুনরায় স্মর্তব্য যে, উপরোক্ত পাঁচটি বিষয় পরস্পর সম্পর্কিত একটি ঝবঃ (পরস্পর–সংযুক্ত একাধিক অনুষঙ্গ-বিশিষ্ট একটি সুবিন্যস্ত জোট)। এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পাঁচটি বিষয়ের প্রত্যেকটি এককভাবে সংঘটিত হতে হবে এবং মিলিতভাবেও সংঘটিত হতে হবে। অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যেকটি বিষয় Inclusively (মিলিতভাবে অন্তর্ভূক্ত) এবং Exclusively (পৃথক পৃথকভাবে) পূর্ণ হতে হবে। এই সকল শর্ত শুধুমাত্র আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার দাবীর মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে যেভাবে উপরে বলা হয়েছে]।

(জ) চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংক্রান্ত মসীহ মাওউদ (আ.) এর ঘোষণা সমুহঃ

একদিকে যেখানে আমরা অন্য কোনো দাবীকারকের লিখনীতে/বইপত্রে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণের ঐশী নিদর্শনের নূন্যতম ইশারা-ইঙ্গিতও পাই না, অপর দিকে আমরা দেখি যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বারবার অত্যন্ত জোরালোভাবে ঘোষণা করেছেন যে, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ ঐশী নিদর্শন তাঁর দাবীর সমর্থনে ঐশী নিদর্শন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখনী থেকে কিছু উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা হলোঃ

*** এই সকল নিদর্শন মানুষের পরিকল্পনাধীনে সংঘটিত হতে পারে না**

–"কেবলমাত্র আমার যুগে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হইয়াছে; আমার যুগেই মহানবী (সা.)–এর সহীহ হাদীস, পবিত্র কোরআন ও পূর্বের কিতাবসমুহ অনুযায়ী দেশে প্লেগ আসিয়াছে; আর আমার যুগেই নতুন বাহন, অর্থাৎ রেলগাড়ীর প্রবর্তন হইয়াছে; আর আমার যুগেই আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ভয়ঙ্কর ভীতি–প্রদ ভূমিকম্প আসিয়াছে। তাহা হইলে আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন না করা কি তাকওয়ার দাবী ছিল না? দেখ, আমি খোদাতা'লার কসম খাইয়া বলিতেছি যে, আমার সত্যায়নে হাজার হাজার নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে ও ভবিষ্যতে হইতে থাকিবে। যদি ইহা মানুষের পরিকল্পনা হইত তবে তাঁহার এতখানি সাহায্য ও সমর্থন কখনো পাওয়া যাইত না।" [হাকীকাতুল ওহী, পৃষ্ঠাঃ ৪৫ (বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠাঃ ৪০), রূহানী খাযায়েন, ২২তম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৪৮]

*** সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে শপথ পূর্বক ঘোষণা**

"আমি আবারো সর্বশক্তিমান আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ এবং আমিই সেই ব্যক্তি যার প্রতিশ্রুতি নবীগণ দিয়ে গেছেন। আমার সম্পর্কে এবং আমার যুগ সম্পর্কে তওরাত, ইঞ্জিল, এবং পবিত্র কুরআনে সংবাদ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আকাশে গ্রহণ সংঘটিত হবে এবং পৃথিবীতে ভয়াবহ প্লেগের প্রাদুর্ভাব হবে।" [দাফেউল বালা, পৃষ্ঠাঃ ১৮, রূহানী খাযায়েন, ১৮শ খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ২৩৮]

*** দাবীর সত্যতার সাক্ষী হিসেবে অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিদর্শন**

"আমি সেই আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ, তিনি আকাশে এই নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন আমার সত্যতার সমর্থনে। আর তিনি এটি সেই সময়ে ঘটিয়েছেন যখন মৌলভীরা আমাকে দাজ্জাল, মহা মিথ্যুক, ভন্ড এবং এমনকি সবচেয়ে বড় প্রবঞ্চকও বলেছিল। এটি সেই নিদর্শন যার সম্পর্কে বিশ বছর আগে আমাকে আমার পুস্তক বারাহীনে আহমদীয়ায় ওয়াদা দেওয়া হয়েছিলঃ তুমি বলে দাও, আমার সঙ্গে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য রয়েছে, তোমরা কি এটা বিশ্বাস করবে, নাকি করবে না? তুমি বলে দাও, আমার সঙ্গে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য রয়েছে, তোমরা কি এটা গ্রহণ করবে, নাকি করবে না? এটা মনে রাখা দরকার, আমার দাবীর সত্যতা প্রতিপাদনে যদিও আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বহু সত্যতার নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে, শতাধিক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে–লাখো ব্যক্তি যার সাক্ষী। কিন্তু এই ঐশী বাণীতে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ, আমাকে এমন নিদর্শন প্রদান করা হবে যা ইতিপূর্বে আদমের যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত আর কাউকে প্রদান করা হয়নি। বস্তুত, পবিত্র কাবা শরীফের সামনে দাঁড়িয়ে আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, এই নিদর্শন ছিল আমার দাবীর সত্যতা প্রমানের উদ্দেশ্যে।"[তোহফায়ে গোলাড়ভিয়া, রূহানী খাযায়েন, ১৭তম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৪৩]

*** ভবিষ্যদ্বাণী–সম্বলিত হাদীসের সত্যতা নিরূপনের উপায়**

–হযরত মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) অত্যন্ত পরিস্কার ভাষায় বলেছেন যে, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের নিদর্শন সম্বলিত হাদীসটি নির্ভরযোগ্য। তিনি লেখেনঃ "ঐ হাদীসটি পুরোপুরিই সঠিক এবং সেটি শুধূ দারকুৎনিতে সংকলিত হয়নি বরং শিয়া ও সুন্নী মজহাবের অন্যান্য হাদীসের সংকলনেও স্থান পেয়েছে। এছাড়া, হাদীস–বিশারদদের কাছে এই মূলনীতিটি গৃহীত যে, যদি কোনো হাদীসে উল্লিখিত কোনো ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করে, তবে ইতিপূর্বে যদি সেটিকে তর্কের খাতিরে মিথ্যা হাদিসও বিবেচনা করা হয়, তারপরও এটিকে সত্য বলে মেনে নিতে হবে। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ্‌ এর সত্যতার সাক্ষ্য দান করেছেন। গায়েবের উপর আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো ক্ষমতা বা জ্ঞান নেই। আল কুরআন বলে, আল্লাহ্‌র বার্তাবাহকই পারে সঠিকভাবে কোনো গায়েবের সংবাদ দিতে, অন্যরা এই পর্যায়ের সম্মান রাখে না। এখানে বার্তাবাহকের মধ্যে রসূল, নবী, মুহাদ্দিস এবং মুজাদ্দিদ অন্তর্ভুক্ত।" [আইয়ামুস সুলেহ, রূহানী খাযায়েন, ১৪ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪১৯-৪৪০]

(চলবে)

প্রশান্তি লাভে একান্তভাবে কাম্য ঐশীপ্রেম

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

কিয়া যওক জিন্দেগীকা
আগার ও' নেহী মিলা

"কী স্বাদ এ জীবনে
যদি না পাই তাঁরে"

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার প্রেম লাভের আকাঙ্ক্ষা আর অনুপ্রেরণা নিয়ে বড়ই আকর্ষণী ছন্দে কী নিখুঁত সত্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। ঐশীপ্রেম লাভে ধার্মিক সমাজে অবশ্যই উভমুখী কর্মজীবন পরিচালনা করতে হয়। তার একদিকে থাকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিজ বান্দাদেরকে ভালবেসে তাদের সাথে এক অবিচ্ছেদ্য প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করেন অপরদিকে ঈমানদারেরাও তাদের নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে সর্বদাই আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসাকেই ধারন করে রাখে। আল্লাহ্ তা'লা এজন্যই বলেছেন, **"ওয়াল্লাযিনা আমানু আশাদ্দু হুব্বা লিল্লাহ"** (সূরা বাকারা ঃ ১৬৬)

অর্থাৎ, যারা ঈমান আনে তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে।

এজন্যই মহানবী (সা.) ঈমান আনার জন্য সর্বপ্রথম যে শর্তটি উল্লেখ করেছেন তাহলো **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"** অর্থাৎ অন্য যে কোন কিছুর চেয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)কে সর্বাধিক বেশী ভালোবাসতে হবে (সহী বুখারী কিতাবুল ঈমান, বাব আ'লাওয়াতুল ঈমান)

মানব প্রকৃতিতে প্রেমের নকশা খচিত রয়েছে, খোদা তা'লার স্মরণে সেই প্রেম জ্যোতির্মন্ডিত হয়ে প্রত্যাবর্তিত হয়। ফলে খোদা ও তাঁর বান্দার মধ্যে জ্যোতির্ময় এক সম্পর্ক সৃষ্টি হয় যা মানুষের প্রতিটি কথা ও কাজকে আলোকোজ্জ্বল করে দেয়। অতএব খোদাপ্রাপ্ত মানুষ, তার প্রভু-প্রতিপালকের গুণে গুণান্বিত হয়ে তাঁরই প্রতিচ্ছায়া হয়ে উঠে।

ঐশীপ্রেমের চিহ্নবালী

এক মু'মিন যখন আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ায় প্রয়াসী হয় তখন আল্লাহ্ তা'লাও তাঁর নিজ বান্দাকে ভালোবাসতে শুরু করে দেন। এটা বুঝবার নিদর্শনমূলক চিহ্ন কী? আল্লাহ্ তা'লার নিজের তা বুঝবার প্রয়োজন পড়ে না, তিনি তো বান্দার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখেন। এজন্য এর পরিমাপ করা আল্লাহ্ তা'লার জন্য নিস্প্রয়োজন। তবে এর আশিস ও কল্যাণ প্রকাশ করতে হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'লা কোন বান্দাকে যখন ভালোবাসেন তখন ফিরিশ্‌তাদের নেতা জীব্রাঈল (আ.)কে তিনি জানিয়ে দেন যে, অমুক বান্দাকে তিনি প্রিয়রূপে গ্রহণ করেছেন, অতএব জীব্রাঈলও যেন তাকে প্রিয় জানে। এটা শুনে জীব্রাইল আকাশের বাসিন্দাদের ডাকতে শুরু করে আর বলে, হে আকাশের বাসিন্দারা! আল্লাহ তা'লা অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন সেজন্য তোমরাও তাকে ভালোবাস। এতে আকাশের বাসিন্দারাও তাকে প্রিয়রূপে গ্রহণ করে, যার ফলে পৃথিবীবাসীদের কাছেও তার গ্রহণীয়তার বিস্তৃতি ঘটে।" (সহীহ বুখারী, হেদাই'ল খুলক বাব যিকরুল মালাই'কা)

এভাবেই জগতে খোদা-প্রেমিক আর খোদার বান্দার প্রেমাস্পদের প্রকাশ ও বিকাশ বিস্তার লাভ করে।

ঐশীপ্রেম লাভের মাধ্যম

ঐশীপ্রেম লাভের বিভিন্ন উপায় রয়েছে। যা অবলম্বন করলে মানুষ সফল হতে পারে। এর প্রতি খোদান্বেষী মানুষের সর্বক্ষণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আর এই বিষয়গুলো অনুশীলনে স্থায়ীভাবে সক্ষমতা লাভ করতে পারলে তা ঐশীপ্রেমের নিদর্শনমূলক চিহ্নে পরিণত হয়। কয়েকটি উপায় নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

(১) ঐশীপ্রেম লাভে দোয়া করা জরুরী

মহানবী (সা.), যার অন্তরের অন্তঃস্থলে ঐশীপ্রেম বিরাজমান ছিল আর তা লালনে তিনিও সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার অত্যন্ত মুখাপেক্ষী থাকতেন। বরং বলতে হয়, তিনি (সা.) ছিলেন খোদা-প্রেমিক আর খোদা তা'লা ছিলেন তার প্রেমাস্পদ, এই উদ্দেশ্য অর্জনে তিনি সারাক্ষণ দোয়ায় নিয়োজিত থাকতেন। এ কারণেই হযরত দাউদ (আ.) এর দোয়া বিশেষভাবে তার (সা.) কেবল পছন্দনীয়ই ছিল না বরং তিনি তার উম্মতকে সেই দোয়া বেশী বেশী পাঠ করতে নির্দেশও দিয়েছেন। দোয়াটি হলো ঃ **"আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা হুব্বাকা ওয়া হুব্বা মাই-ইউ হেব্বুকা ওয়াল আ'মালাল্লাযি ইউ বাল্লেগনী হুব্বাকা আল্লাহুম্মা আজআল হুব্বাকা আহাব্বা ইলাই-ইয়া মিনান্নাফসি ওয়া আহলি ওয়া মিনাল মাইল বারিদ"।**

অর্থাৎ, হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার সমীপে তোমারই ভালোবাসা যাচনা করি আর সেই লোকদের ভালোবাসাও যারা তোমাকে ভালোবাসে আর আমাকে সেই কর্মের প্রতি আসক্ত করে দাও যা আমাকে তোমার প্রেমালোকে পৌঁছিয়ে দিবে। হে আমার খোদা! তুমি এমনটা কর যে, তোমার ভালোবাসাকে আমার নিজ জীবন, আর আমার সন্তান-সন্ততি ও পিপাসা নিবারণকারী ঠান্ডা পানির সরবতের থেকেও আমার কাছে অধিকতর প্রিয় করে দাও।

(২) সাধনা দ্বারা ঐশীপ্রেম লাভ হয়

আল্লাহ্ তা'লার প্রেম লাভ করতে হলে মানুষকে বিশেষভাবে চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও অবিরত সাধনা চালিয়ে যেতে হয়, তবেই তাঁর অনুগ্রহে আর পথ-প্রদর্শনে ঐশীপ্রেম অর্জিত হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র

কুরআনে যেমনটি বলেছেন, **"ওয়াল্লাযীনা যাহিদু লা নাহ্‌দি ইয়ান্নাহুম সুবুলানা"** (সূরা আনকাবুত ঃ ৭০)

অর্থাৎ, আমার সাথে মিলিত হতে যারাই চেষ্টা-সাধনা করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথ-পানে আসতে সক্ষমতা দান করি।

(৩) ঐশীপ্রেমের পথে পদচারণাতেই আল্লাহ্‌র ভালোবাসা লাভ হয়

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হাদীসে কুদসী অনুযায়ী মহানবী (সা.) তার প্রভু-প্রতিপালকের উদ্ধৃতিতে বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার বান্দা আমার পানে এক বিঘত পরিমাণ এগিয়ে এলে আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হই। আমার দিকে সে একহাত এগিয়ে এলে আমি তার নিকটে দুই হাত এগিয়ে যাই। আবার আমার পানে সে হেঁটে হেঁটে এগোতে থাকলে আমি তার নিকটে ছুটে চলে যাই। (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুয্ যিকরুদোয়া, ফযলুয্ যিকর)

অতএব, ভালোবাসার প্রকাশ আর ঐশীপ্রেম অর্জনের প্রচেষ্টায় মানুষকে সর্বদা লেগে থাকতে হয়। আর মানুষের উচিত এই প্রচেষ্টায় যথাযথ মর্যাদা দিয়ে তাঁরই ভালোবাসায় সর্বদা নিবেদিত হয়ে থাকা।

(৪) বাধ্যতামূলক ইবাদত ছাড়াও নফল ইবাদতে ঐশীপ্রেম আকর্ষণ করা যায়

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর অনুরূপ এক বর্ণনা রয়েছে, হাদীসে কুদসীর ঐ বর্ণনায় মহানবী (সা.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমার সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় হলো ফরয ইবাদত। আর এছাড়াও আরও কিছু রয়েছে, যেমন আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করে থাকে। এতটা নৈকট্য পায় যে, আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। আর আমি তাকে ভালোবাসলে আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে, তার চোখ হয়ে যাই যদ্বারা সে দেখে, আর তার হাত হই যদ্বারা সে আঁকড়িয়ে ধরে, আবার তার পা হই যদ্বারা সে চলাফেরা করে। আবার যখন সে আমার কাছে যাচনা করে আমি তাকে দিয়েও থাকি। আর যদি সে আমার নিরাপদ আশ্রয় প্রার্থনা করে তাহলে আমি তাকে সুরক্ষা দান করি। (সহীহ বুখারী, কিতাবুর রাকাব বাতোওয়াযা')

(৫) মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্য আবশ্যক

সৈয়্যদনা হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "ইসলামের খোদা কারো জন্য স্বীয় আশিসের দরজা বন্ধ করেন না, বরং তিনি নিজের দুই হাত প্রসারিত করে আহ্বান জানান-'আমার পানে এসো'। যারা আন্তরিকতার সাথে সজোরে আগেভাগে তাঁর পানে দৌড়ে আসে তাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হয়।

অতএব, আমি কেবল খোদার অনুগ্রহে, না আমার কোন গুণের কারণে এ পুরস্কারের পুরো অংশ লাভ করেছি যা আমার পূর্বে নবী-রসূল ও সম্মানীত ব্যক্তিবর্গকে দেয়া হয়েছিল। আমি যদি আমার সৈয়্যদ ও মাওলা, নবীগণের গৌরব, সৃষ্টি-কুলের শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পথের অনুসরণ-অনুগমন না করতাম তবে এ পুরস্কার লাভ করা আমার জন্য অসম্ভব ছিল। সুতরাং আমি যা কিছু পেয়েছি তারই (সা.) অনুবর্তিতায় পেয়েছি। আমি আমার পরিপূর্ণ জ্ঞানে সত্যই জানি মহানবী (সা.) এর আজ্ঞানুবর্তিতা ছাড়া কোন মানুষ না খোদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে আর না পরিপূর্ণ জ্ঞানের অংশ লাভ করতে পারে। প্রসঙ্গত: আমি এ-ও বলছি যে, কোন্ সে বস্তু যা মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ আজ্ঞানুবর্তীতার ফলে মানব হৃদয়ে সর্বপ্রথম জন্মলাভ করে? স্মরণ রাখতে হবে তা হলো সুস্থ্য হৃদয় অর্থাৎ সেই হৃদয় সুস্থ্য, যা হতে জাগতিক ভালোবাসা তিরোহিত হয়ে সে এক অনন্ত ও স্থায়ী স্বাদের অন্বেষণকারী হয়ে যায়। এরপর হৃদয়ের সেই সুস্থতার দরুন একটি স্বচ্ছ ও পরিপূর্ণ ঐশীপ্রেম অর্জিত হয়। এইসব পুরস্কার মহানবী (সা.) এর আজ্ঞানুবর্তিতার কারণে উত্তরাধিকাররূপে পাওয়া যায়।

যেমনটা আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)কে ঘোষণা দিতে বলেছেন, **কুল ইনকুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিওনী ইউহ্‌বিবকুমুল্লাহ** (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩২)।

অর্থাৎ তাদেরকে বলে দাও, তোমরা যদি খোদাকে ভালোবাস তবে এসো আমার অনুবর্তিতা কর। যাতে খোদাও তোমাদেরকে ভালোবাসেন। বরং একতরফা ভালোবাসার দাবী সম্পূর্ণরূপে একটি মিথ্যা ও গালগল্প মাত্র। মানুষ সত্যিকারভাবে যখন খোদা তা'লাকে ভালোবাসে তখন খোদাও তাকে ভালোবাসেন। পৃথিবীতে তখন তার গ্রহণযোগ্যতা বিস্তৃত করে দেয়া হয়। আর হাজার হাজার মানুষের হৃদয়ে তার জন্য খাঁটি ভালোবাসা সৃষ্টি করা হয়। তাকে আকর্ষণ করার শক্তি দান করা হয়। তাকে একটি জ্যোতি দান করা হয়, যা সদা সর্বদা তার সাথে থাকে। একজন মানুষ খাঁটি অন্ত:করণে যখন খোদাকে ভালোবাসে এবং সমগ্র পৃথিবীর ওপর তাঁকেই প্রাধান্য দেয় ও গায়রুল্লাহ (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সবকিছু)-এর কোন মহিমা ও প্রতাপ তার হৃদয়ে আর অবশিষ্ট থাকে না, বরং সেই সবকিছুকে সে মৃতকীটের চেয়েও অধম মনে করে, তখন খোদা, যিনি তার হৃদয় দেখেন তিনি এক তেজোদীপ্ত জ্যোতির্বিকাশের সাথে তার ওপর অবতীর্ণ হন। একটি স্বচ্ছ আয়নাকে যখন সূর্যের বিপরীত দিকে এমনভাবে রাখা হয় যে সূর্যের প্রতিবিম্ব এর ওপর পরিপূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়, তখন রূপকভাবে বলা যেতে পারে যে, ঐ সূর্যই যা আকাশে আছে তা এখন এই আয়নাতেও বিদ্যমান।

অনুরূপভাবেই খোদা এইরূপ ব্যক্তির হৃদয়ে অবতীর্ণ হন আর তার হৃদয়কে নিজের আরশে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র গুণাবলীর পবিত্র অবস্থানস্থলে পরিণত করে নেন। (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ২২, পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫)

(৬) মমতার সাথে পরোপকার করা

অন্যের সাথে সদ্ভাব ও সদ্ব্যবহার করা আর পরোপকার সাধন মানুষকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভে নিকটতর করে দেয়। আল্লাহ্ তা'লা নিজেই পবিত্র কুরআনে করীমে যেমনটা উল্লেখ করেছেন–

"ওয়া আহাসানু ইন্নাল্লাহা ইউহেব্বুল মুহসেনীন" (বাকারা ঃ ১৯৬)

অর্থাৎ- মমতাপূর্ণ পরোপকার কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ নিঃস্বার্থ পরোপকারীদের ভালবাসেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন– "এমন এক সহানুভূতির প্রেরণা নিয়ে পরোপকার কর, যেমন করা হয় অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সাথে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শুধু মমতা মাখা স্নেহের আবেগেই মাতা সন্তানের প্রতি কল্যাণময় আচরণ করে থাকেন

সন্তানের কাছে কোন বিনিময় প্রত্যাশা করেন না। কল্যাণ সাধনের এই চূড়ান্ত পর্যায়, যা ডিঙ্গিয়ে কল্যাণময় আচরণের উন্নতি করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়।" (ইসলামী উসুল কি ফিলোসফী, পৃষ্ঠা-৫৭)

এই মানের পরোপকারে ব্রতী হলে পর ঐশীপ্রেম ধারায় মানব সিক্ত হয়ে থাকে।

(৭) সত্যিকার তওবা দ্বারা আকর্ষিত হয় ঐশীপ্রেম ধারা

সত্যিকারের তওবা মনুষকে ধৌত ও পরিচ্ছন্ন করে, আর এতে আধ্যাত্মিকভাবে তার নব জনম লাভ হয়। আর আল্লাহ্‌র সমীপে সে যেন নিষ্পাপ অবস্থায় নিজেকে উপস্থাপিত করে। এটা এমন এক অবস্থা যা আল্লাহ্ তা'লা খুবই পছন্দ করেন পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারায় মহান আল্লাহ্ এমটাই বলেছেন– **ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল তাওয়াবিন** (সূরা বাকারা ঃ ২২৩) অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদেরকে যারা তাঁর দিকে বারবার প্রত্যাবর্তন করে থাকে এবং সত্যিকারের তওবা করে নিশ্চয়ই তিনি তাদেরকে ভালবাসেন।

আবার সূরা বাকারার ১২৯ আয়াতের ***ওয়াতুব্ আলাইনা***-অংশে তওবার কথা বর্ণিত হয়েছে আর তাতে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, শেষ 'শরীয়ত'-বিধিবিধানের গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক থাকবে **রাব্বি তাওয়াবা–** তওবা কবুলকারী রব-প্রত্যাবর্তনকারীর প্রত্যাবর্তন গ্রহণকারী প্রভু-প্রতিপলকের সাথে। আর এর আজ্ঞাবহরা ও এর অনুসারীরা এ মৌলিক নীতির তাৎপর্য বুঝে যাবে যে তওবা ও ইস্তেগফার ব্যতীত মারেফতে ইলাহী-আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান ও ঐশী সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব নয়। **তাবাল্লাহ আলাইহি**-এর অর্থ **তাওবাতুহু** এক উপাসনাকারী সৃষ্টি করলেন আর সে তওবা করলে তিঁনি তার তওবা কবুল করে নিলেন। এখানে একথাও রয়েছে যে, **'ওয়া তুব্ আলাইনা'** দোয়া বলা হয়েছে, 'তওবা ইস্তেগফার'-এর অভ্যন্তরে যে তাৎপর্য নিহিত রয়েছে তা যথার্থভাবে ও প্রকৃত অর্থে এইক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে আর এই বান্দাদেরকে এমন এক শরীয়ত প্রদান করা হয়েছে যা তওবা ও ইস্তেগফার বিষয়াদিকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে বিশ্লেষণসহ বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন– "মানুষ পবিত্রতার উচ্চ মার্গে ও মধ্যস্ততার উঁচু স্তরে তখনই পৌঁছাতে পারে যখন সে নিজের দুর্বলতা দূর করতে আর অন্যদেরকে পাপের বিষমুক্ত করতে প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে প্রতিটি মুহূর্তে দোয়ারত থাকে ও অনুনয় বিনয় ও মিনতির সাথে খোদা তা'লা প্রদত্ত শক্তি আকর্ষণ করে নিজের দিকে টানতে থাকে আর কামনা করে যে এ শক্তি সামর্থ্যের অংশ অন্যরাও লাভ করুক, যাতে ঈমানের সাথে তাদের সংযোগ সাধিত হয়ে যায়।

নিষ্পাপ মানুষের খোদা তা'লার কাছে শক্তি সামর্থ্য যাচনা করা এজন্য অতি আবশ্যক যে, মানব-প্রকৃতি তো নিজ সত্ত্বায় কোন সৌন্দর্য, ও পূর্ণতাই ধারণ করে না বরং খোদা থেকেই শক্তি ও সামর্থ্য লাভ করে আবার নিজ সত্ত্বায় কোন আলোকময় দ্যুতি ও জ্যোতিও রাখে না বরং খোদা থেকেই তার ওপর আলোকময় দ্যুতি নিপতিত হয়।

এর প্রকৃত রহস্য এই যে সৌন্দর্য্য আকাঙ্ক্ষী প্রকৃতি-কে কেবল এক আকর্ষণ ও অনুরাগ প্রদান করা হয় যাতে সে অনন্ত সীমাহীন সৌন্দর্যময় মহাশক্তিকে নিজের দিকে টানতে, আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। যেহেতু পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যে সদা-বিদ্যমান ওই ভান্ডার থেকে ফিরিশ্‌তারাও শক্তি টেনে নেয়, অনুরূপভাবে পূর্ণ-মানবও শক্তির ওই মহা উৎস থেকে ইবাদতের-দাসত্বের নলপথ **(উবুদিয়ত কি নালী)** দিয়ে পবিত্র ও কল্যাণপূর্ণ শক্তি আকর্ষণ করে নিজের দিকে শুষে নেয়... অতএব দেখ ইস্তেগফার কী জিনিষ!

এ-ই হচ্ছে অনুবর্তিতার ফল! যে পথে শক্তি নিঃসরিত হয়ে সঞ্চিত হয়। তৌহীদের-একত্ববাদের গূঢ় রহস্য এ নীতির সাথে সম্পৃক্ত যে, পবিত্র গুণাবলীকে মানুষের এক মহামূল্যবান অনন্য সম্পদ নির্ধারণ না করে বরং তা অর্জনের নিমিত্তে খোদাকেই মূল উৎস নির্ধারণ করা।" (রিভিউ অফ রিলিজিয়নস উর্দূ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৯-১৮০)।

ঐশীপ্রেমের পথে সাধকদের আশান্বিত করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন,

"অতএব দূর্বলতা ঝেড়ে ফেলে উঠে পড়, তওবা কর। নিজ প্রভু ও মালিককে সৎকর্ম দিয়ে সন্তুষ্ট করতে লেগে যাও। স্মরণ রেখো! ধর্মবিশ্বাসজনিত ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির শাস্তি মৃত্যুর পরে হয়ে থাকে। হিন্দু বা খৃষ্টান না মুসলমান-এর সিদ্ধান্ত হবে কিয়ামত দিবসে। কিন্তু যে ব্যক্তি যুলুম-নির্যাতন ও পাপ কর্মে এবং নির্লজ্জতায় ও ছিদ্রান্বেষণে সীমা ছাড়িয়ে যায়, ওই অবস্থান তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। কোন ভাবেই সে খোদা প্রদত্ত শাস্তি থেকে পালাতে পারে না।

অতএব নিজ খোদাকে শীঘ্র সন্তুষ্ট করো নচেৎ সেদিন সমাগত...। তোমরা খোদার সাথে আপোষ রফা করে ফেলো, সন্ধি করে নাও। তিনি বড়ই দয়াবান! এক মুহূর্তের বিনম্র তওবায় সত্তুর বছরের পাপ মোচন হয়ে যেতে পারে। আর এটা বলো না যে তওবা গৃহীত হয় না। মনে রেখো, তোমরা নিজেদের আমল দ্বারা- কৃত কাজ কর্ম দ্বারা কখনও বাঁচতে পারো না। সর্বদা তাঁরই অনুগ্রহ তোমাদের রক্ষা করে– কর্ম নয়।

হে পরম দয়াময় ও বারবার কৃপাকারী খোদা! আমাদের সবার প্রতি করুণা কর যাতে আমরা তোমার দাস হয়ে তোমারই আস্তানায় পড়ে থাকতে পারি।" (আমীন!) (লেকচার লাহোর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ২০, পৃষ্ঠা ১৪৭)।

(৮) বাহ্যিক ও আত্মিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা

আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় সত্ত্বায় অতি পাক-পবিত্র, এজন্য তিনি তাদের কাছেই নিজের ভালোবাসার প্রকাশ ঘটান যারা সর্বপ্রকার পাক-পবিত্রতা সুরক্ষা করে চলে। পবিত্র কুরআনে তিনি এমনটাই বলেছেন, **ইউহেব্বুল মুতাতাহ্-হেরীন** (সূরা বাকারা ঃ ২২৩) অর্থাৎ তিনি বাহ্যিক ও আত্মিক পরিচ্ছন্নতা অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন। পবিত্র কুরআনে আরও বর্ণিত হয়েছে **আন্ তাহ্‌হিরা বায়তীয়া** (সূরা বাকারা ঃ ১২৬) আর এতে আমাদের শিখানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লার এটা পরিকল্পনা যে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দিয়ে, বান্দার নোংরা ময়লা ধৌত করার বন্দোবস্ত করা। ইসলামের শরীয়তে প্রকাশ্যভাবে দৈহিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পালন এবং আধ্যাত্মিক পবিত্রতা অর্জনের জন্য আমরা দেখতে পাই সূরা মায়েদার ৭ নম্বর আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ইসলাম প্রদত্ত শিক্ষা অনুযায়ী দেহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যকীয় বিষয়।

এজন্য নবী করীম (সা.) ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ দেহ পরিষ্কার রাখা, পোশাক পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন রাখা, গৃহ নোংরা না রাখা, পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, মসজিদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পাকপবিত্র রাখতে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া, কথাবার্তায় পরিষ্কার সরল সোজা থাকা, কান পরিষ্কার, চোখ পরিষ্কার, নাক পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন এসব শিক্ষার বিস্তারিত গভীরে প্রবেশ করলে চিন্তা-ভাবনা করলে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বাহ্যিক ও আত্মিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার দ্বারা আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়ায় চেষ্টিত থাকতে হবে। কাজেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন ও পাক-পবিত্রতা অর্জন। এর দ্বারা আমরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ দয়া ও করুণার ফলে ঐশীপ্রেমের পুরস্কার পেতে সক্ষম হবো। এইজন্যই আল্লাহ্ তা'লা শিক্ষা দিয়েছেন আমাদের অভ্যন্তরে কোন দুর্গন্ধ নোংরা ময়লা ও অপবিত্রতা যেন অবশিষ্ট থেকে না যায়। তবেই আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রেমধারায় অবগাহনে সক্ষম হবো।

(৯) তাক্ওয়ার পথ অবলম্বন করা

সৎকর্ম করতে এবং কল্যাণ সাধনে তাক্ওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যথার্থই বলেছেন,

হার এক নেকী কী যার্ ইয়ে ইত্তেকা হ্যায়
গর্ ইয়ে জড় রাহি তো সবকুছ রাহা হ্যায়

অর্থাৎ, এক-একটি সৎকর্মের মূলে এই তাক্ওয়াই রয়েছে, এই মূল যদি অক্ষত থাকে তাহলে সবকিছুই রয়ে গেল।

সুতরাং, ঐশীপ্রেম অর্জন করতে হলে তাক্ওয়া অবলম্বন হলো মৌলিক শর্ত। সূরা আলে ইমরানের ৭৭ নম্বর আয়াতে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে, **বালা মান আওফা বিআহদিহি ওয়াত্তাক্বা ফইন্নাল্লাহা ইউহেব্বুল মুত্তাক্বীন** অর্থাৎ, প্রকৃতই নিজ অঙ্গীকার যে পূর্ণ করে আর তাক্ওয়া অবলম্বন করে সেক্ষেত্রে মুত্তাকীদের নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ভালোবাসেন।

(১০) আপদ-বিপদ ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করা

মু'মিনদের জীবনে উন্নতি লাভের জন্য দুঃখ-কষ্ট ও ক্লেশ বরণ আবশ্যকীয় হয়ে থাকে। সে কারণে বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করাও ঐশীপ্রেম আকর্ষণে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, **"ফামা ওয়াহানু লিমা আসাবাহুম ফি সাবিলিল্লাহ্ ওয়ামা যাউ'ফু ওয়ামা আস্তাকানু ওয়াল্লাহু ইউহেব্বুস্-সাবেরীন"** (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৭) অর্থাৎ- অতএব আল্লাহ্‌র পথে তাদের ওপর যে বিপদ এসেছিল তাতে তারা হীনবল হয়ে পড়ে নাই, তারা দুর্বলতা দেখায় নাই এবং (শত্রুদের সামনে) নতও হয় নাই। আর আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।

(১১) কেবল আল্লাহ্ তা'লাকেই নির্ভরস্থলরূপে গ্রহণ করা

মানবজীবনে চলার পথে বহু চরাই-উৎরাই পাড়ি দিতে হয়। সকল অবস্থাতেই আল্লাহ্ তা'লার এক-অদ্বিতীয় সত্তার ওপর নির্ভর করা এবং তাঁরই ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখা মানুষকে খোদা তা'লার কাছে পছন্দনীয় ও প্রিয়তর করে দেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, **"ফা ইযা আজামতা ফাতাওয়াক্কাল আলাল্লাহে ইন্নাল্লাহা ইউহেব্বুল মুতাওয়াক্কেলীন"** (আলে ইমরান ঃ ১৬০) অর্থাৎ– তুমি যখন (কোন বিষয়ে) দৃঢ়সংকল্প করে ফেল তখন আল্লাহ্‌রই ওপর ভরসা কর, নিশ্চয় আল্লাহর ওপর ভরসাকারীদের আল্লাহ্ ভালোবাসেন।

(১২) ন্যায় বিচার করা

ন্যায় বিচার করা বা ন্যায়পথ অবলম্বন অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য যা অবলম্বন করা হলে জগতে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজমান থাকে। এজন্যই ঐশীপ্রেম অর্জনের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো ন্যায়নুগ ব্যবস্থা অবলম্বন করে চলা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা এই প্রসঙ্গে বলেছেন, **"ওয়া ইন হাকামতা ফাহ্‌কুম বায়নাহুম বিলক্বিস্‌তে ইন্নাল্লাহা ইউহেব্বুল মুক্বসেতিন"** (আল মায়েদা ঃ ৪৩) অর্থাৎ- তুমি যদি বিচার কর তাহলে তাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকদের ভালোবাসেন।

(১৩) পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত ধর্মবিশ্বাস পোষণ করা

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে বলেন, "সর্বাগ্রে যা জরুরী তা হলো প্রথমতঃ নির্মল নিষ্কলুষ বিশুদ্ধ ধর্মবিশ্বাস ধারণ করা। মু'মিনের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী তিনিই হলেন খোদা যিনি কুরআনের মাধ্যমে জগতে উন্মোচিত হয়েছেন। যতক্ষণ সেই খোদাকে জগত সনাক্ত করতে না পারছে ততক্ষণ তার সাথে কোন সম্পর্ক কিংবা তাঁর প্রতি কোন প্রেমানুরাগ সৃষ্টি হতেই পারে না, বুলি-সর্বস্ব বড় বড় কথায় কিছুই ঘটার নয়, অতএব আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে ধর্মবিশ্বাসকে সঠিক করে নেয়ার পর পরবর্তী ধাপ হলো পবিত্র সাহচর্যে থেকে আধ্যাত্মিক তত্ত্বদর্শনে উন্নতি লাভ করা এবং দোয়ার মাধ্যমে তাঁরই সাহায্যের প্রত্যাশী হওয়া। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-দর্শন লাভে আর ঐশী সাহায্য লাভে যত অগ্রগতি ঘটতে থাকবে ঐশীপ্রেমেও ধীরে ধীরে ততই উন্নতি সাধিত হবে। স্মরণ রাখা উচিত, প্রকৃত প্রেমানুরাগ শূণ্য-ভূমিতে আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি ঘটা সম্ভবই নয়। (মলফুযাত ১ম খন্ড, ২০০৩ ঈসাব্দে রাবওয়ায় মুদ্রিত, পৃষ্ঠা ৪৬১)

(১৪) যুগ-খলীফার পবিত্র সান্নিধ্যলাভে সদা সচেষ্ট থাকা

আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদেরকে নির্দেশ করেছেন– **"ইয়্যা আইয়্যুহাল্লাযিনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়া কুনু মা আ'স্‌সাদেক্বীন"** (সূরা আত্তাওবা ঃ ১১৯) অর্থাৎ, হে যারা ঈমান এনেছা! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর সত্যবাদীদের সাহচর্য অবলম্বন কর।

অতএব, ঐশীপ্রেম আকর্ষণের জন্য যুগ-খলীফার সাথে এক জীবন্ত সম্পর্ক বজায় রাখা অত্যাবশ্যক এক বিষয়। এই যুগে আধ্যাত্মিকভাবে ও দৈহিকভাবেও খলীফাতুল মসীহ্ (আই.) এর সাথে এক স্থায়ী জীবন্ত সম্পর্ক বজায় রাখার অতুলনীয় এক মাধ্যম হলো স্যাটেলাইট টেলিভিশন–এম,টি,এ। হুযূর (আই.) প্রতি সপ্তাহে জুমুআর খুতবা এবং পথনির্দেশনামূলক বিভিন্ন উপদেশ দান করে থাকেন যা প্রতিনিয়তই এমটিএ-তে অহরাত্র সম্প্রচারিত হয়ে থাকে। হুযূর প্রদত্ত দিকনির্দেশনা অনুযায়ী আত্মশুদ্ধিতে নিয়োজিত থাকলে এবং হুযূর সমীপে দোয়ার প্রত্যাশী হলে কাঙ্খিত ঐশীপ্রেমে প্রশান্তি লাভ সহজসাধ্য ও সহজতর হওয়া সম্ভব।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে উপরোক্ত পন্থাসমূহ অবলম্বনের মাধ্যমে ঐশীপ্রেম আকর্ষণপূর্বক প্রশান্তি লাভে পরিতৃপ্ত করুন। আমীন।

জামা'তী কর্মকর্তা নির্বাচন এবং তাদের দায়-দায়িত্ব

(কুরআন, হাদীস ও খলীফাগণের নির্দেশনার আলোকে)

মওলানা মোহাম্মদ আরিফুর রহিম

খোদা তা'লার ফজলে জামাতে আহমদীয়া বাংলাদেশের ৩৮তম ন্যাশনাল মজলিসে শূরা ১৩ ও ১৪ই মে ২০১৬ সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বছরটি জামাতে আহমদীয়ার নির্বাচনের বছর। পুরাতনদের পাশাপাশি অনেক নতুন কর্মকর্তাও নির্বাচিত হয়ে থাকেন এজন্য খলীফাগণের নির্দেশনার আলোকে জামাতের কর্মকর্তা নির্বাচনের পদ্ধতি ও তাদের দায় দায়িত্বের বিষয়ে কিছু আলোকপাত করছি।

পৃথিবীতে কোন কাজ নেযাম বা কোন ব্যবস্থাপনা ব্যতীত সঠিক এবং সুন্দর ভাবে চলতে পারে না। আর সবচেয়ে বড় হলো কুদরত বা অলৌকিক নেযাম, সেখানে প্রত্যেক বস্তু খোদা তা'লার ইচ্ছা অনুযায়ী এবং একই ব্যবস্থাপনার অধীনে চলছে। যার উল্লেখ খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনে সূরা ইয়াসিনের মধ্যে এভাবে করেছেন যে,

"আর সূর্য এর নির্ধারিত গতিপথে ছুটে চলছে। এই মহাপরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ (আল্লাহ্‌র) বিধান।

আর চন্দ্রের জন্যও আমরা কক্ষপথ নির্ধারিত করে দিয়েছি। অবশেষে তা (কক্ষপথ অতিক্রম করতে করতে) খেজুর গাছের পুরাতন ডালের ন্যায় হয়ে ফিরে আসে।

চন্দ্রকে ধরে ফেলার ক্ষমতা সূর্যের নেই এবং রাতও দিনকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে না। এরা প্রত্যেকেই (নিজ নিজ) কক্ষপথে ধাবমান রয়েছে"। (সূরা ইয়াসীন আয়াত ঃ ৩৯,৪০, ৪১)

সুতরাং খোদা তা'লার সমস্ত ব্যবস্থাপনা-সমস্ত বিশ্বজগত একটি নির্দিষ্ট নেযামের অধীনে চলছে। আর এই কারণে পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের জন্যও খোদা তা'লা এটি চেয়েছেন যে তারাও যেন একটি ব্যবস্থাপনা বা নেযামের অধীনস্ত হয়ে চলে। আর এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা নবী রসূল পাঠিয়েছেন। যারা এসে মানুষের মধ্যে খোদা তা'লার ইবাদত ও সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসার শিক্ষা দিয়েছেন যাতে করে সকল মানব আত্মা এক নেযামের অধীনে সমস্ত কাজ করতে পারে।

এই সকল সার কথার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এতটুকু যে আমরা যেন এই বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করি যে, এই পৃথিবীতে বসবাস করার জন্য আমাদের নেযাম ছাড়া কোন বিষয় সফলতার পথ দেখাতে পারে না। আর এরই জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্তম পদ্ধতি, কুরআন করীমে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে আমাদেরকে এ বিষয়টি শিখানো হয়েছে এবং এ বিষয়ের ওপর চলার দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আর এই পদ্ধতির অধীনে জামাতে আহমদীয়াতেও সকল আহমদীদের সমস্ত দুনিয়ার, পথপ্রদর্শক এবং রূহানী ও আখলাকী তরবিয়ত ও সংশোধনের জন্য একটি নেযাম হযরত আকদাস মুহাম্মদ (সা.) এর গোলামে সাদেক হযরত আহমদ (আ.) এর মাধ্যমে জারি করা হয়েছে। যেটি বরকত পূর্ণ খেলাফত ব্যবস্থাপনা বা নেযাম। আর এই খেলাফতের কল্যাণে জামাত খোদাতা'লার ফজলে শুধুমাত্র পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে যায়নি বরং প্রতিনিয়ত যে সকল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে তা এই নেযামের মাধ্যমে নির্দেশনা নিয়ে সেগুলির মুকাবেলা করছে।

জামাতে আহমদীয়া প্রত্যেক দেশে নিজেদের নেযাম বা ব্যবস্থাপনা খেলাফতে আহমদীয়ার আকাঙ্খা এবং দিক নির্দেশনা অনুযায়ী চালিয়ে থাকে। এছাড়া খলীফাতুল মসীহ্ সাধারণ ভাবে বিভিন্ন দেশে সফরে গিয়ে এবং জুমুআর খুতবা ও অন্যান্য বক্তৃতার মাধ্যমে জামাতের রূহানী, আখলাকী এবং সদস্যদের খোদার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।

এই ব্যবস্থাপনা বা নেযাম চালানোর জন্য বিভিন্ন দেশে কর্মকর্তা বানানো বা নির্বাচন করা হয়ে থাকে। তাদের নির্বাচন কিভাবে এবং কিসের ভিত্তিতে হয়ে থাকে, এই বিষয়ে ইসলামী শিক্ষা তথা কুরআন করীম এবং হাদীসে কি নির্দেশনা পাওয়া যায় এছাড়া খলীফাগনের নির্দেশনা কি হয়ে থাকে তা তুলে ধরতে চাই ।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আই.) এর দিকনির্দেশনা উপস্থাপন করছি। তিনি (আই.) গত ৫ই ডিসেম্বর ২০০৩ জুমুআর খুতবায় কর্মকর্তাদের নসিহত করতে গিয়ে বলেন ঃ "জামাতে আহমদীয়ার নেযাম বা ব্যবস্থাপনা একটি এমন নেযাম বা ব্যবস্থাপনা যেটি শৈশব থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেক আহমদীকে একটি পবিত্র ভালোবাসার বন্ধনে বেধে রখেছে।"

আর এটি হলো নেযামে জামাতের উদ্দেশ্য এবং এটি হলো সেই মূল্যবান নসিহত যে আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে নিজেকে এই পবিত্র ও ভালোবাসার বন্ধনে বেধে রাখতে হবে।

*** কর্মকর্তা নির্বাচনে কুরআনের নির্দেশনাঃ** পবিত্র কুরআনে সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে নির্বাচনের জন্য যে নির্দেশনা বর্ণনা করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) ৩১ ডিসেম্বর ২০০৪ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় বলেন যে, সর্বপ্রথম তো আমরা কুরআন করীম থেকে নির্দেশনা নিয়ে থাকি যে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে কি নির্দেশ দিয়েছেন। নিজেদের কর্মকর্তা কিভাবে মনোনীত করতে হবে, হুযুর বলেন আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি, তার অর্থ হলো, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের আমানতসমুহ এর যোগ্য ব্যক্তিদের ওপর ন্যস্ত

করার আদেশ দিচ্ছেন। আর তোমরা যখন শাসন কাজ পরিচালনা কর তোমরা মানুষের মাঝে ন্যায়পরায়নতার সাথে শাসন করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র উপদেশ কতই চমৎকার! আল্লাহ্‌ অবশ্যই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।' (সুরা নিসা আয়াত: ৫৯)

হুযূর (আই.) জামাতকে নসিহত করতে গিয়ে বলেন, "প্রথম কথা এই যে কর্মকর্তা নির্বাচনকারীগণকে উদ্দেশ্য বলা হয়েছে যে, ঐ ব্যক্তিকে নির্বাচন কর যে এটির হকদার এবং যোগ্য, আর যে কাজের জন্য তাকে মনোনীত করছ সে কি এটি করতে পারবে এবং সময় দিতে পারবে, এমনটি নয় যে তার সাথে তোমার সম্পর্ক রয়েছে এই জন্য তাকে নির্বাচিত করতে হবে। প্রত্যেক সদস্য তো ভোট দিতে পারে না। যে ব্যক্তি ভোট প্রদানের হকদার হয় তার সর্বদা দোয়া করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত যে সর্বোত্তম তাকে যেন ভোট দিতে পারে।"

একই জুমুআর খুতবায় নসিহত করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, "এটিও যেন স্মরণে থাকে, নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী এবং যিনি নির্বাচিত হবেন, কোন কোন সময় অন্তরে এই খেয়াল এসে থাকে যে কোন পদ জামাতের কারও জন্ম থেকে পাওয়ার অধিকার নেই বা কেউ এটির স্থায়ী হকদার। এজন্য সেবা করার যে সুযোগ মিলে থাকে সেটি আল্লাহ্‌ তা'লার ফযল। আল্লাহ্‌ তা'লা স্বয়ং সেবা করার সুযোগ দিয়ে থাকেন। নিজেই কখনও আকাঙ্খা করা উচিত নয়, আর কখনও ইশারার মাধ্যমেও প্রকাশ করা উচিত নয় যে আমাকে কর্মকর্তা বানাও এবং না কোন ব্যক্তির এই অধিকার আছে যে, কারও জন্য এই ইশারা করা যে উমুক ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া যায়। ব্যবস্থাপনাগণ যদি এ বিষয়ে জানতে পারেন তাহলে যে ভোট চায় এবং যার জন্য ভোট চাওয়া হয়েছে উভয়কেই ভোটদান করা থেকে বিরত রাখতে পারেন। এছাড়া তাদেরকে শাস্তি প্রদানও করতে পারেন।

হুযুর (আই.) আরও বলেন , কখনও কোন কর্মকর্তার মনে যেন এই চিন্তা না আসে যে উমুক ব্যক্তি আমাকে ভোট দেয়নি অথবা আমার বিরুদ্ধে উমুক ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল এজন্য আমার যদি কখনও সুযোগ হয় কখনও কোন বিষয়ে তাহলে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করবো। এটি মু'মিনের বৈশিষ্ট নয় বরং এটি চরম অধঃপতন ছাড়া কিছুই নয়"। (খুতবাতে মাসরূর, ২য় খণ্ড)

একই ভাবে হুযূর আনোয়ার (আই.) ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে জুমুআর খুতবায় বলেন, "নির্বাচন হয়ে থাকে কর্মকর্তাও পরিবর্তন হতে থাকে। তাই প্রত্যেককে এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, যখনই সে কর্মকর্তা মনোনীত হবে , সে এক সেবকের ন্যায় সেবা করার জন্য হবে। কিছু কিছু সময় এমন হয়ে থাকে যে কর্মকর্তা পরিবর্তন হয়ে যান বা খলীফায়ে ওয়াক্ত নিজের ইচ্ছায় কিছু কর্মকর্তা পরিবর্তন করে দেন তাই নতুন ব্যক্তিরা এসে শামিল হয়ে থাকেন। তাই নতুন আগত ব্যক্তিদের মধ্যে চিন্তা ধারাও এমন হওয়া উচিত।

হুযূর আনোয়ার (আই.) এর নসিহতের সারসংক্ষেপ হলো এই যে ঃ

(১) ভোট এক প্রকার আমানত (২) ভোট ঐ ব্যক্তিকে প্রদান করা যে তাকওয়াশীল (মুত্তাকী) (৩) কোন আত্মীয় অথবা বন্ধু বা সম্পর্কের ভিত্তিতে কাউকে ভোট দিও না। (৪) ভোট প্রদান করার ক্ষেত্রে দোয়া করে সিদ্ধান্ত নেওয়া (৫) কারও পক্ষে প্রপাগান্ডা না করা (৬) পদ জন্ম থেকে পাওয়ার অধিকার নেই কেননা এটি যিনিই পান তার জন্য একটি কল্যাণ (৭) সেবার মনোভাব নিয়ে দায়িত্বের ওপর কাজ করা উচিত।

হযরত আমিরুল মু'মিনীন (আই.) জুমুআর খুতবায় হযরত রসূল (সা.) এর নির্দেশনা বর্ণনা করেন। হুযুর বলেন," তবুও কি তোমরা পদের জন্য আকাঙ্খা করবে, প্রথমেও আমি বলেছি এটি এমন একটি বিষয় যেটি জামাতে খুবই লজ্জাস্কর মনে করা হয়ে থাকে আর ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে যে এই বিষয়ে চেষ্টা করে। এই বিষয়ে একটি হাদীস এভাবে বর্ণনা এসেছে যে "হযরত আব্দুর রহমান বিন সামারাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে আঁ হযরত (সা.) আমাকে বলেছেন, হে আব্দুর রহমান! ইমারত ও হুকুমাত এর বাসনা করো না। যদি তোমাকে এটি না চাইতে মিলে যায় তাহলে তোমাকে এই দায়িত্বের বিষয়ে সাহায্য করা হবে অর্থাৎ যদি আকাঙ্খা না থাকে আর দায়িত্ব পেয়ে যাও তাহলে আল্লাহ্‌ তা'লা ফযল করেন এবং তার বান্দাকে সাহায্য করেন। আর যদি তোমার চাওয়াতে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্‌ তা'লার শাস্তি তোমার ওপর বর্ষিত হবে। আর সামান্যতম যদি ভুল হয় তাহলে শাস্তি অধিক বেশী হয়ে থাকে। (সহীহ বুখারী)" (খুতাতে মাসরূর, ২য় খণ্ড)

"এছাড়া কর্মকর্তাদের বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নসিহত রয়েছে যেটি উল্লেখ করা আবশ্যক। আল্লাহ্‌ তা'লার ফযলে জামাতের অধিকাংশই জামাতের পদ লাভের আকাঙ্খা প্রকাশ করেন না যদি পদ এসে যায় তাহলে তার মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি হয় যে আমি এ দায়িত্ব আদায় করতে পারবো কি পারবো না। কিন্তু কিছু মানুষ এমন হয়ে থাকে যে চিঠি লিখে পাঠিয়ে থাকেন যে আমাদের জামাতে সঠিকভাবে কাজ হচ্ছে না। আবেদক লেখেন যে, আমি এটি জানি যে কোন পদের আকাঙ্খা করা উচিত নয় কিন্তু তারপরও আমি মনে করি আমার ওপর ইমারাত বা উমুক দায়িত্ব যদি দেওয়া হয় তাহলে আমি ছয় মাস বা এক বছরের মধ্যে সংশোধন করতে পারবো। কিছু মানুষ তো এভাবেই খোলা-খুলি লিখে পাঠান। কিন্তু কিছু মানুষ খুবই সতর্কতার সাথে উপস্থাপন করে থাকে তাদের বিষয়ে আমি এটিই বর্ণনা করবো আমাদের নেযামে, জামাতে আহমদীয়ার নেযামে যদি কোন নির্বাচনের সময় কারও নাম প্রস্তাব করা হয় তাহলে সে নিজেই নিজেকে ভোট দেওয়ার অধিকার রাখে না। তাই নিজে নিজেকে ভোট দেওয়াতেও একথা প্রকাশ পায় যে আমি এই পদের যোগ্য। এই ধরনের লোকদের এই হাদীসটি দৃষ্টিতে রাখা উচিত।

"হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা.) থেকে বর্ণিত যে আমি রসূল (সা.) এর কাছে যাই আর আমার সাথে আমার ২ জন চাচাতো ভাই ছিলেন। তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাকে এই দেশ গুলোর মধ্য থেকে কোন একটি দেশের (যা আল্লাহ্‌ তা'লা আপনাকে দিয়েছেন) আমীর বানিয়ে দিন। এমনিভাবে ২য় জনও একই কথা বলল। এটি শুনে আঁ হযরত (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম আমি দেশের সেবা ঐ ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করি না যে এটি পাওয়ার জন্য আবেদন করে বা লালায়িত থাকে। (সহীহ্‌ মুসলিম)

হুযূর আনোয়ার (আই.) এই হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, "হে আব্দুর রহমান! পদ এবং হুকুমাত এর আবেদন কখনও করো না, কেননা আবেদনের ফলে যদি তোমাকে পদ মিলে তাহলে সেটির বোঝা তোমাকেই বহন করতে হবে আর যদি না চাওয়াতে মিলে তাহলে খোদা তা'লার সাহায্য সর্বদা তোমার সাথে থাকবে।

হুযূর (আই.) তার বক্তৃতার মধ্যে হযরত

মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর একটি উদ্ধৃতি পেশ করেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন "কিছু মানুষের এই স্বভাব হয়ে থাকে যে তারা এই ধরনের পদ পাওয়ার জন্য মজলিসে অংশগ্রহণ করে থাকে। এমন ব্যক্তি তার জাতির জন্য ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে এবং নিজের জন্যও ধ্বংস বয়ে আনে। আর সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার ব্যাপারে খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, ফাওয়াইলুল্লিল মুসাল্লিন আল্লাযীনা হুম আন সালাতিহিম সাহুন। আল্লাযীনা হুম ইউরাউনা (সূরা মাউন ঃ ৫-৭) তাদের সব কিছু লোক দেখানো হয়ে থাকে, কাজ করার কোন ইচ্ছা তাদের নেই।

কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্য নসিহত ঃ

হুযূর আনোয়ার (আই.) ২০০৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর কর্মমর্তাদের দায়দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করতে গিয়ে বলেন ঃ "পরিশেষে আমি দ্বিতীয়বার সংক্ষেপে বর্ণনা করছি যে, কথাগুলো আমি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেছি আর এগুলি খলীফাগণ পূর্ব থেকে বলে আসছেন কিন্তু একটি দীর্ঘ সময় চলে যাওয়ার পর কিছু কথা মনে থাকে না এছাড়া যারা নতুন কর্মকর্তা হিসাবে মনোনীত হচ্ছেন এবং যারা সঠিক ভাবে বোঝে না বা অজানা বা বার বার স্মরণ করাতে হয়। তাই এর সারসংক্ষেপ হলো এই যে,

(১) কর্মকর্তাদের জন্য আবশ্যক তারা নিজেরা আনুগত্যের উত্তম নমুনা দেখাবেন, নিজের উপরস্থ কর্মকর্তার সম্পূর্ণ আনুগত্য ও সম্মান করবেন। আপনি যদি এমনটি করেন তাহলে আপনার নিচে যারা আছে, জামাতের সদস্য, ষ্টাফ আপনার পূর্ণ আনুগত্য করবে।

(২) এটি স্মরণ রাখবেন যে, সকলের সাথে নম্রতা দেখাবেন। তাদের মন জয় করতে হবে। তাদের সুখ-দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। আপনি যদি এই অভ্যাস তৈরী করতে না পারেন তাহলে এর অর্থ এই হবে যে এমন কর্মকর্তার মনে অহংকার রয়েছে।

(৩) আমীর, কর্মকর্তাগণ অথবা মরকযী কর্মী এই দোয়া করবেন যে তাদের অধীনস্ত বা যার অধিনস্ত তাকে করে দেওয়া হয়েছে তিনি যেন ভদ্র ও সুশীল স্বভাবের হন, জামাতের আনুগত্যের রূহ তার মধ্যে থাকে এবং নেযামে জামাতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তার মধ্যে থাকে।

(৪) কখনও কোন জামাতের সদস্যের সাথে কোন বিষয়ে বৈষম্যমূলক আচরণ করবেন না। আর এটি স্মরণ রাখবেন যে কিছু মানুষ খুবই বক্র স্বভাবের হয়ে থাকে। আমি জানি, এরা আমীর, কর্মকর্তা অথবা নেযামে জামাতের ঘাম ছুটিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। কিন্তু এরপরও যতদূর সম্ভব তাদের বেয়াদবী সহ্য করবেন, আর তাদের পক্ষ থেকে যত কষ্টই পেতে থাকুন কোন প্রকার অভিযোগ করবেন না। প্রতিশোধ নেওয়ার চিন্তাও যেন কখনও মনে না আসে। তাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ্ তা'লার নিকট সাহায্য চাইবেন।

(৫) নেযামে জামাতের দৃঢ়তা ও হেফাযত সবার ওপরে রাখতে হবে আর এর জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। কখনই নিজের আশপাশে 'জী হুযূর' করে যারা বা তোষামদকারীদেরকে একত্রিত হতে দিবেন না। যে সকল কর্মকর্তার ওপর এই ধরনের লোকদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এমন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে কোন ন্যায় বিচার আশা করা যায় না। এ ধরনের কর্মকর্তাগণ তাদের হাতের পুতুল হয়ে যান। আর এ জন্যই আঁ হযরত (সা.) এই দোয়া করেছেন যে, আল্লাহ্ যেন কখনও মন্দ পরামর্শদাতা আমার আশে পাশে একত্র না করেন।

(৬) সুতরাং স্মরণ রাখার বিষয় এই যে, যেভাবে আমি পূর্বেও বর্ণনা করেছি, যতক্ষণ নেযামের সম্মান ও মর্যাদা বিপন্ন না হয় ততক্ষণ ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করবেন। তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন যা তাদের সংশোধনের কারণ হয়। এগুলো তো কর্মকর্তাদের জন্য কিন্তু পরিশেষে আমি জামাতের সদস্যদের জন্যে কিছু বলছি আর তা হলো আপনাদের উপরও যারা কর্মকর্তা নন একটি অনেক বড় দায়িত্ব রয়েছে তা হলো, আপনাদের কাজ শুধুমাত্র আনুগত্য, আনুগত্য এবং আনুগত্য করা ও সাথে দোয়া করা, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্ব বোঝার তৌফিক দান করুন।" (খুতবাতে মাসরূর, ১ম খণ্ড)

হুযূর (আই.) নসিহত করতে গিয়ে বলেন যে, "জামাতে আহমদীয়ায় স্টেজে বসার বা অহংকারের সাথে ঘুরে বেড়ানোর জন্য কর্মকর্তা বানানো হয় না বরং এই উদ্দেশ্যে বানানো হয়ে থাকে যে, জাতির সর্দার জাতির সেবক হবেন। আপনি খলীফায়ে ওয়াক্তের প্রতিনিধি আপনি যদি আপনার জামাতের আহমদীদের অধিকার আদায় না করেন। তাদের সুখে ও দুঃখে শামিল না হন। তাদের সাথে উত্তম ও ভালবাসার ব্যবহার না করেন, অথবা খলীফা ওয়াক্তের পক্ষ থেকে যদি কোন বিষয়ে রিপোর্ট চাওয়া হয় তাহলে সঠিক পদ্ধতি ও তদন্ত ছাড়া উত্তর পাঠিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে বা কোন ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে যেটি খোদা না করুন আমাদের কোন কর্মকর্তার মধ্যে থাকুক, ভুল রিপোর্ট দিয়েছেন, তবে এই সকল কর্মকর্তা গুনাহগার হয়ে থাকেন।" (খুতবাতে মাসরূর, ১ম খণ্ড)

হযরত আমীরুল মু'মিনীন (আই.) খুতবার শেষ ভাগে এসে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর লেখনি থেকে উল্লেখ করেন যে,

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, "খোদা তা'লা তোমাদেরকে এমন এক জামাত বানাতে চান যে, তোমরা সমস্ত জগতের জন্য নেকী এবং তাক্ওয়ায় উত্তম নমুনা প্রদর্শনকারী হও। সুতরাং নিজেদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তিকে দ্রুত বের করে দাও যে অনিষ্টকারী , ফিতনাবাজী এবং মন্দ প্রদর্শনকারী। আমাদের জামাতের যে ব্যক্তি অনাড়ম্বর জীবন যাপনকারী,নেক ও পরহেযগার, মিষ্টভাষী, নরম মেজাজের এবং কোমল স্বভাবের সাথে চলতে পারবে না সে যেন অতি দ্রুতই আমাদের ছেড়ে চলে যায়। কেননা খোদা চান না এমন ব্যক্তি আমাদের সাথে থাকুক এবং অবশ্যই সে দুর্ভাগা হয়ে মৃত্যু বরণ করবে কেননা সে নেকীর পথ অবলম্বন করেনি। সুতরাং তোমরা সাবধান হয়ে যাও এবং সত্যিকার অর্থে অনাড়ম্বর জীবন যাপনকারী, মিষ্টভাষী, নরম স্বভাবের এবং মুত্তাকী হয়ে যাও। তবেই তুমি পাঁচওয়াক্ত নামাযী এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী হিসাবে গন্য হবে। আর যার মধ্যে মন্দ স্বভাব বিদ্যমান সে এই নসিহ্যতের ওপর কখনও কায়েম থাকতে পারে না"। (মাজমাউল ইশতেহার- ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৮) (খুতবাতে মাসরূর, ১ম খণ্ড)

অতএব আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীম, হাদীসে নববী, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর (আ.) খলীফাগণের দিক নির্দেশনার আলোকে জামাতের এবং সাধারণ সদস্যদের নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

ইসলামের নামে কেন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড

মাহমুদ আহমদ সুমন

আইএস নামের জঙ্গিগোষ্ঠী বিশ্বজুড়ে ত্রাস সৃষ্টি করেছে। মানবতার শত্রু এই জঙ্গি-সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন সময়ে তাদের নাম পরিবর্তন করেছে। কখনো তালেবান, কখনো আল-কায়েদা, কখনো আইএস নামে পরিচিত হলেও বিশ্বমানবতার প্রতি হুমকি হয়েছে এই গোষ্ঠীগুলো।

গত ১৪ জুলাই বৃহস্পতিবার রাতে ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলীয় নিস শহরে জাতীয় দিবস উদযাপনের সময় ট্রাক হামলায় নিহতের হয়েছে ৮৪ জন এবং আহত হয়েছেন আরো অন্তত শতাধিক। বাস্তিল দিবস উদযাপন উপলক্ষে নিস শহরের বিখ্যাত প্রমেনেদ দে আঁগলাইসে জনতা যখন আতশবাজি পুড়িয়ে আনন্দ উদযাপনে মত্ত তখনই দ্রুতগতির ২৫ টনের একটি ট্রাক ইচ্ছে করেই চালক উঠিয়ে দেন জনতার ওপর। এর ফলে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে। ধারণা করা হচ্ছে, এভাবে জনসমাবেশে ট্রাক তুলে দিয়ে মানুষ হত্যার এই ঘটনা বৈশ্বিক জঙ্গিবাদেরই নতুন মাত্রা। প্যারিসে আইএস জঙ্গিদের হামলায় ১৩০ জন নিহত হওয়ার ঘটনার আট মাসের মাথায় আবার এমন ন্যাক্কার জনক ঘটনা ঘটল।

ফ্রান্সের এ ঘটনার মাত্র কয়েক দিন পূর্বে রাজধানীর কূটনীতিকপাড়া গুলশানের এক স্প্যানিশ রেস্টুরেন্টে জঙ্গিরা নৃশংসভাবে হত্যা করে ২০ জিম্মিকে। জঙ্গিরা এক বাংলাদেশি ও ১৭ বিদেশি নাগরিকের প্রত্যেককে বারবার ধারালো অস্ত্র দিয়ে নৃশংসভাবে কুপিয়ে, গুলি করে ও গলা কেটে হত্যা করে। এ ছাড়া বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক অবিন্তা কবীর ও এক জাপানি নারীকে মাথায় ভারী ও ভোঁতা অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করা হয়। জিম্মিদের মধ্যে ভারতীয় তরুণী তারিশি জৈনের সারা শরীরে ৪০টির মতো আঘাত করা হয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে। হলি আর্টিজানের জিম্মিদশায় নিহত দেশি-বিদেশি নাগরিক ও জঙ্গিদের ময়নাতদন্তে এসব তথ্য উঠে এসেছে। ময়নাতদন্ত-সংশ্লিষ্টরা বলছেন, হামলাকারী জঙ্গিদের বর্বরতা বনের পশুর হিংস্রতাকেও হার মানিয়েছে।

গুলশানের ঘটনার শোক কাটিয়ে ওঠার আগেই ঈদের দিন সকালে কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় দেশের সবচেয়ে বড় ঈদ জামাতের মাঠের কাছে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যদের ওপর জঙ্গিরা হামলা চালায়, গুলি ও কুপিয়ে দুই কনস্টেবলসহ চারজনকে হত্যা করা হয়।

জঙ্গিবাদ এখন এক বৈশ্বিক সংকট হিসেবেই দেখা দিয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ জঙ্গি সমস্যা নিয়ে চিন্তিত। গত কয়েক মাসে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে একের পর এক জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে। প্রতিটি হামলায়ই যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা। বিশ্বের কোন প্রান্তই যে জঙ্গি হামলার আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয় ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম কিংবা তুরস্কে জঙ্গি হামলার পর তা স্পষ্ট হয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকা শুধু নয়, বিশ্বের কোন দেশই বোধ হয় শতভাগ নিরাপদ নয়। আধিপত্যবাদ বজায় রাখতে গিয়ে সৃষ্ট জঙ্গি-সন্ত্রাস আজ শান্তিকামী মানুষের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। আইএস নামের জঙ্গিগোষ্ঠী বিশ্বজুড়ে ত্রাস সৃষ্টি করেছে। মানবতার শত্রু এই জঙ্গি-সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন সময়ে তাদের নাম পরিবর্তন করেছে। কখনো তালেবান, কখনো আল-কায়েদা, কখনো আইএস নামে পরিচিত হলেও বিশ্বমানবতার প্রতি হুমকি হয়েছে এই গোষ্ঠীগুলো। আমাদের হৃদয় ফেটে যায়, চোখের অশ্রু আটকিয়ে রাখা যায় না যখন শুনি এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে ইসলামের নামে। আল্লাহ্ এবং রসূলের নামে এই অন্যায় সংঘটিত হচ্ছে।

ইসলাম হচ্ছে বিশ্বমানবতা, শান্তি ও মুক্তির ধর্ম। মানব জাতিকে ভালো, মন্দ, সত্য, ন্যায়বোধ উপলব্ধির মাধ্যমে মুক্তির যে বারতা তা ধর্ম আমাদের শেখায়। ধর্মীয় চেতনার মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে নিজেকে। সে শাশ্বত ধর্ম প্রেরণা মানুষের হৃদয়-আত্মা থেকে উৎসারিত হয়। তাই বলা হয়, ধর্ম মানুষের আত্মার খোরাক, মানুষের মনের গভীরে ধর্মের যে ভীত প্রোথিত তা বিনষ্ট করা কোন শক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। তবে মাঝে মাঝে উগ্রবাদী সন্ত্রাসী জঙ্গিগোষ্ঠীর ধর্মের চেতনার ওপর আঘাত হানে, মানুষ হত্যা করে। সহজ-সরল মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। এগুলো ধর্মীয় মূল্যবোধ, ধর্মীয় চেতনা, ধর্মের মর্মবাণী ও মূল স্রোতধারার পরিপন্থী।

সকল প্রকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নি:সন্দেহে ইসলাম বিরোধি কাজ। ইসলাম এমন একটি ধর্ম যে ধর্ম সকলের শান্তি কামনা করে। কারো ওপর আঘাত করার শিক্ষা ইসলামে নেই। তাই ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম। সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলাম নামের ধর্মকে

মহান আল্লাহতাআলা এ পৃথিবীতে বিশ্ব নবী, সর্ব জাতির নবী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে শান্তির অমিয় বাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন। মহান খোদা তা'লার এক নাম 'ছালাম' অর্থাৎ শান্তি। বিশ্বনিয়ন্ত্রণকর্তা সব সময়ই মানুষকে শান্তির দিকে আহ্বান করে থাকে। প্রকৃত শান্তির ধারক ও বাহক ইসলাম ধর্মের নিষ্ঠাবান শান্তিপ্রিয় অনুসারী মুসলমান কখনো সমাজের ও দেশের অশান্তির কারণ হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গীন দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছেন আর রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বানিয়েছেন সকলের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে হযরত নবী করীম (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, 'নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের ওপরে অধিষ্ঠিত' (৬৮: ৫)। হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর অনুসরণের মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তির জীবন শান্তিময় হতে পারে, হোক সে ইহুদী, খ্রিষ্টান বা যে কোন ধর্মের অনুসারী।

মহানবী (সা.) যিনি পশুতুল্য মানুষকে ফেরেশতায় রুপান্তর করেছিলেন। আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগে যখন মানব সমাজ তাদের নিজস্ব পরিচয় মনুষত্ব হারিয়ে ইচ্ছা মাফিক ও স্বেচ্ছাচারী জীবন নিয়ে মত্ত ছিল ঠিক তখনই কোরাইশ বংশের মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরব জাহান তথা বিশ্ব মানবকূলের জন্য প্রেরণ করেন শান্তির বাণী দিয়ে হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-কে। জন্মলগ্ন থেকে যার উছিলায় শান্তির স্বপক্ষে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশ্বময় রহমত আসতে থাকে। কতই না চমৎকার তার আদর্শ, বিশ্বস্ততা, একনিষ্ঠতা, সত্য, ন্যায় এবং ইসলামের শান্তির কথা বলে, কোটি কোটি হৃদয়কে আকর্ষিত করেছিলেন। সমাজে তার (সা.) লড়াই ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠার লড়াই, আর এ লড়াই ছিল ভালবাসার লড়াই। বোমাবাজি বা অস্ত্রেও লড়াই নয়।

তিনি (সা.) প্রকৃত ইসলামি দর্শন, কুরআন মাফিক বিশাল এলাকা গড়ে তুলতে শাসক হিসেবে, যোদ্ধা হিসেবে, সঠিক সিদ্ধান্ত দেবার ক্ষেত্রে অসাধারণ দৃষ্টান্ত তার উম্মতের জন্য রেখে গেছেন। তিনি (সা.) সমাজে কোন ধরনের অশান্তির লেশমাত্র রেখে যান নি। অন্ধকার সমাজ ছিল, যেখানে কোন আলো দেখা যেত না, সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশটির বুকে আলো জ্বালিয়ে দেখিয়েছেন ইসলাম আসলেই যে শান্তির ও কল্যাণের ধর্ম। তিনি (সা.) শুধু মাত্র একটি সুন্দর সমাজই প্রতিষ্ঠা করেন নাই বরং প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা কি? ইসলাম পালন করলে কি লাভ এবং ইসলাম পৃথিবীতে কেন এসেছে এ সব কিছুই তিনি (সা.) তার কর্ম দ্বারা শিখিয়ে গিয়েছেন।

ইসলাম প্রকৃতই যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে শান্তির নিশ্চয়তা দেয় তা-ও তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। ইসলামের গৌরবজনক ইতিহাস, অনুশাসন, ঐতিহ্যবাহী জীবন ব্যবস্থায় নারীর মূল্যায়ণ। পুরুষসহ সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রশ্ন ও প্রেক্ষিত এবং সমাধান দেখে ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই ঈমান এনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। সবাই এ কথাও বলতে বাধ্য হয়েছিল, ইসলামই একমাত্র শান্তির ধর্ম হতে পারে। তাই সবাই ইসলামকে শান্তির ধর্ম হিসেবেই গ্রহণ করেছে। এই শান্তির ধর্মে কোন ধরণের বল প্রয়োগের শিক্ষা নেই। ইসলাম কাউকে হত্যা করার শিক্ষা দেয় না। হত্যার ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা হল–'আর কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করলে এর প্রতিফল হবে জাহান্নাম। সেখান সে দীর্ঘকাল থাকবে। আর আল্লাহ্ তার প্রতি রাগান্বিত। তিনি তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য এক মহা আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন' (সূরা আন নেসা, আয়াত: ৯৪) কাউকে হত্যার ব্যাপারে ইসলামের নবী বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে মোকদ্দমার ফয়সালা করা হবে তা হবে রক্তপাত (হত্যা) সম্পর্কিত' (বুখারী)। কাউকে হত্যা করাকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে, শুধু নিষেধ করেই শেষ করে নাই বরং যারা এসব সন্ত্রাসী ও জঙ্গি কার্যক্রম করে তাদের শাস্তি কত ভয়াবহ সে সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। ইসলামের শিক্ষা কত উন্নত যে বল প্রয়োগ করে ইসলামের প্রচার করতে পর্যন্ত বারণ করা হয়েছে।

শেষ দিকে আমি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর সন্ত্রাস বিরোধী প্রয়াসের দু'টি উক্তি তুলে ধরছি। ২০১৪ সালের ৮ই নভেম্বর ইউ'কে'র জাতীয় শান্তি সম্মেলনে ইসলামের শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যের শিক্ষা উপস্থাপন করার পর হযরত খলীফতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন, 'প্রত্যেক আহমদী মুসলমান এবং নিশ্চয়ই প্রত্যেক শান্তিপ্রিয় মুসলমান তাদের ধর্মের এরূপ বিকৃত অপব্যবহারে দারুণভাবে মর্মাহত। তথাপি এ পর্যায়ে আমি সে-সব মানুষ, প্রতিষ্ঠান ও রাজনীতিবিদকে প্রশ্ন করতে চাই যারা চরমপন্থীদের অত্যাচার অনাচারের ছুঁতো ধরে ইসলামকে একটি নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ধর্ম বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। আমি তাদের জিজ্ঞেস করি, এসব চরমপন্থীদল কীভাবে এত বড় অংকের অর্থ সম্পদ লাভ করল যার কারণে তারা এত দীর্ঘ সময় ধরে এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাতে সক্ষম? তারা এসব অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র পেল কোথায়? তাদের কাছে কী সমরাস্ত্র প্রস্তুত করার জন্য শিল্পকারখানা বা ফ্যাক্টরি রয়েছে? বলা বাহুল্য, এরা কোন দেশ বা পরাশক্তির সাহায্য সমর্থন লাভ করছে। হতে পারে তা কোন তেল সমৃদ্ধ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ অথবা কোন পরাশক্তি আড়াল থেকে এদেরকে সহযোগিতা প্রদান করে চলেছে। ...সব ধরনের উগ্রবাদ ও জঙ্গিবাদ নিরসনে একটি ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত প্রয়াস কেন নেয়া হয় না?...ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি এ ধরনের সন্ত্রাসী ও চরমপন্থীদলগুলোকে অনেক স্বল্প সময়ে দমন করা সম্ভব যদি বিশ্বের সমস্ত দেশ এগুলোকে উচ্ছেদ করার ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও আন্তরিক হয়।'

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) গত নভেম্বর মাসে প্যারিসের ন্যক্কারজনক হত্যাকাণ্ডের পর এর নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, 'নিরীহ মানুষ হত্যা করা কোনক্রমেই বৈধ হতে পারে না আর যারা নিজেদের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডকে ইসলামের নামে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করছে তারা কেবল সর্বনিকৃষ্ট পন্থায় ইসলামকে দুর্নাম করার কাজে রত। (২০১৫ সালের ১৪ই নভেম্বর প্রদত্ত প্রেস রিলিজ)

মহান খোদা তা'লা সবাইকে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা ও শ্রেষ্ঠ নবীর আদর্শ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

masumon83@yahoo.com

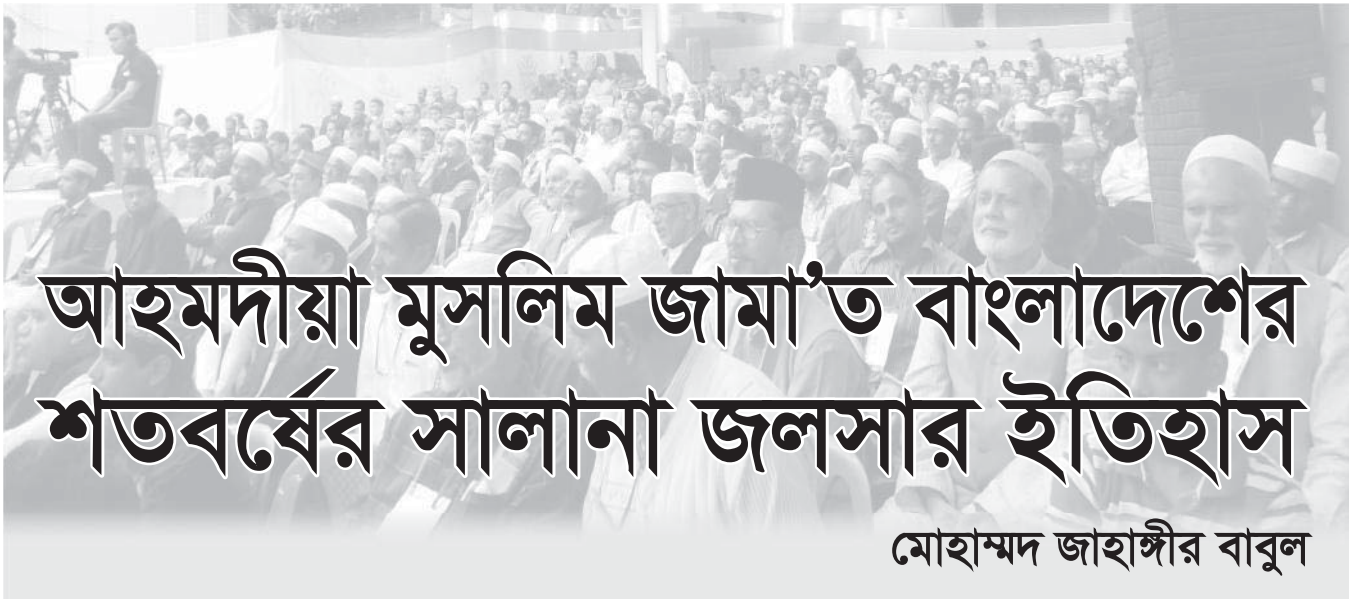

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(১৪তম কিস্তি)

১৯৭১–১৯৭৩

১৯৭১ সালের ১২-১৪ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের উত্তাল তরঙ্গের সময় দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে জলসা করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। তখন সারা দেশ যুদ্ধ বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার অবকাঠামো ভেঙ্গে যায়। ফলে উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতিতে ১৯৭২ সালেও জলসা করা সম্ভব হয়নি। অতঃপর ১৯৭৩ সালের ৬-৮ এপ্রিল ৫০তম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এটা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সালানা জলসা। কর্মসূচি অনুসারে ৬ এপ্রিল প্রথম অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন বাংলাদেশ জামাতে আহমদীয়ার আমীর মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব। তিনি তাঁর ভাষণের শুরুতে বলেন, প্রথমে আমি হযরত আকদাস আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ সালস (আই.)-এর পক্ষ থেকে জামাতের সকল বন্ধুকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু জানাচ্ছি। তিনি সদা আমাদের জন্য দোয়া করছেন। কাদিয়ানের আমীর ও নাযেরে আলা সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব এবং সকল দরবেশেরও সালাম আপনাদেরকে জানাচ্ছি। তাঁরাও সদা আমাদের জন্য এবং এই জলসার কামিয়াবীর জন্য বিশেষভাবে দোয়া করছেন। সকল প্রশংসা রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ তা'লার জন্য। তিন বছর পর তিনি আবার আমাদেরকে জলসা করার সুযোগ দিয়েছেন। এতদিন ধর্মের নামে আমাদের দেশে ধর্মবিরোধী বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। সব তারিফ আল্লাহ্ তা'লার জন্য। এখন আমাদেরকে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করি তিনি যেন বর্তমান হুকুমতকে ইসলামের মহান শিক্ষা **লা ইকরাহা ফিদ্দীন ক্বাদ তাবাইয়্যানার্ রুশদু মিনাল গাইয়্যি** অর্থাৎ ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই, নিশ্চয় সত্য পথ মিথ্যা হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে- এই আদর্শ বজায় রেখে শান্তি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে এই দেশকে দ্রুত উন্নতি ও সমৃদ্ধির সাথে পরিচালিত করার তৌফিক দেন।

পরিশেষে এ জলসায় থাকা ও খাওয়ার সুবিধা ও অসুবিধা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। যেখানে বহু লোকের সমাগম হয় এবং স্থানের স্বল্পতা থাকে, সেখানে অনেক অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে এ জলসা মহামর্যাদা সম্পন্ন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জলসা। এ জলসার ব্যবস্থাকারী ও যোগদানকারী জামাতের সকলেই তাঁর খাদেম এবং আমরা পরস্পর ভাই। সুতরাং আপনারা যদি এ জলসার ব্যবস্থাকে নিজ ঘরের ব্যবস্থা বলে মনে করেন, তাহলে সবকিছু সহজ হয়ে যাবে। নিজ গৃহের সকল অসুবিধা আমরা ধরি না, এখানে তাই করতে হবে। বরং আমরা রূহানী জামাত হিসেবে আমাদের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা বেশি ও ব্যবহার সুন্দরতম হতে হবে। এই জলসায় যারা নিজেদেরকে বিভিন্ন খেদমতে পেশ করেছেন, তারা আমাদের ভাই। তাঁরা নেক নিয়তে খেদমতের প্রেরণার কাজে লেগেছেন। পারতপক্ষে তাঁরা কর্তব্যে ত্রুটি করবেন না আমরা জানি। তবু আপনাদের সেবার কোন ত্রুটি হলে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপন ভ্রাতাকে ক্ষমা করে নিজ রূহের লাবণ্য ও শক্তি বৃদ্ধি করে নেবেন এবং জলসার উদ্দেশ্যকে স্মরণ করে জামাতের উচ্চ আদর্শ ও রূহানী নমুনাকে অম্লান রাখবেন। মনে রাখবেন এ জলসা আমাদের জাগতিক উৎসবের জন্য নয়। এখানে আমরা রূহানী উৎসবের জন্য এসেছি। রূহানীয়তের এই বাগিচায় আপনারা সকলে সমবেত হয়েছেন হৃদয়ের কালিমা ধুয়ে নিতে, ঈমানকে মজবুত ও আত্মাকে উজ্জল করতে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাগণের সঙ্গে সম্বন্ধকে নিকট করতে। অতএব আপনাদের সকলের প্রচেষ্টা হবে আপনাদের মধ্যে কে হৃদয়কে কত বেশি আলোকিত করে, অধিকতর আধ্যাত্মিক সম্পদ ও শক্তি এবং আল্লাহ্ তা'লার ফযল ও রহমত নিয়ে ঘরে ফিরেন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলের হাদী এবং হাফেজ ও নাসের হউন এবং আমাদের ওপর তাঁর ফযল ও রহমত নাযেল করুন। এখন আসুন, আমরা সকলে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া করি। (পাক্ষিক আহমদী ৩০

এপ্রিল ১৯৭৩)।

তখন জলসায় রাবওয়া থেকে জামাতের আহমদীয়ার কোন প্রতিনিধি আসা সম্ভব হয়নি। তবে পবিত্র ভূমি কাদিয়ান থেকে মোহতরম মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেব এক পয়গাম প্রেরণ করেন। ফলে স্বাধীন দেশে নতুন পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ সালানা জলসা অনেক গুরুত্ব বহন করে। বাংলাদেশের দিনাজপুর হতে চট্টগ্রাম এবং সুন্দরবন হতে সিলেট বিস্তৃত সকল অঞ্চল হতে সহস্রাধিক আহমদী যোগদান করেন। চারটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া লাজনা এবং খোদ্দামুল আহমদীয়ার অতিরিক্ত অধিবেশনও হয়েছে।

৬ এপ্রিল জুমুআর নামাযের পর মোহতরম মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব আমীর বাংলাদেশ জামাতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম অধিবেশনে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করেন মাওলানা আবুল খায়ের মুহিবুল্লাহ্ সাহেব এবং নযম উর্দু পাঠ করেন মৌলবি মোহাম্মদ ছলিমুল্লাহ্ সাহেব। চেয়ারম্যান জলসা কমিটি ভিজির আলী সাহেব অভ্যর্থনা ভাষণ দান করেন। তিনি জলসার বৃহৎ উদ্দেশ্যাবলী বলতে গিয়ে জলসা সালানার গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ঈমান উদ্দীপক উদ্ধৃতি পাঠ করেন। কাদিয়ান হতে মোহতরম মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেবের প্রেরিত পয়গাম মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ পাঠ করে শুনান। এই আন্তরিকতাপূর্ণ পয়গামে তিনি ধর্ম ও কর্ম-সেবা এবং মানব কল্যাণে আহমদী জামাতের মহান নীতি এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশ্লেষণ করে সকলকে যথাসাধ্য কুরবানী করার জন্য আন্তরিক আহ্বান জানান। জলসা বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, বি এ এম আবদুস সাত্তার, জনাব মকবুল আহমদ খান, জনাব আব্দুল জব্বার, জনাব সালাহ উদ্দিন খন্দকার, মৌলবি মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, জনাব মোহাম্মদ শামসুর রহমান, জনাব শহীদুর রহমান, জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, মওলানা এ, কে, মহীবুল্লাহ্, ডা. আবদুস সামাদ খান চৌধুরী, অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, জনাব বদরউদ্দিন আহমদ।

সবশেষে মোহতরম আমীর সাহেব তাঁর জ্ঞানগর্ব ও ঈমানবর্ধক সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বর্তমান পরিস্থিতিতে জামাতে আহমদীয়ার সর্বজনীন তালিম তরবিয়ত ও তবলিগী দায়িত্ব এবং কর্তব্যসমূহের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। পরিশেষে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আই.) এর ১৯৬৮ সালের সালানা জলসায় বর্ণিত গভীর তত্ত্বমূলক ও মর্মস্পর্শী দোয়া সমূহ পাঠ করে শুনান, যা উপস্থিত সকলের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। অতঃপর আবেগ ভরা ইজতেমায়ী দোয়ার সাথে এই বরকতপূর্ণ সালানা জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

জলসার সময়ে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে বার জন ব্যক্তি বয়আত করে জামাতভুক্ত হন। তাঁদের মধ্যে তিনজন মহিলা এবং একজন নও-মুসলিমও রয়েছেন। তিনদিন ব্যাপী অধিবেশনগুলোতে তিন সহস্রাধিক শ্রোতার সমাগম হয়। সকলেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ ও তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতাসমূহ অত্যন্ত আগ্রহ ও মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন এবং জলসা অত্যন্ত শান্তিও গাম্ভির্যপূর্ণ এবং আধ্যাত্মিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। (পাক্ষিক আহমদী, ৩০ এপ্রিল ১৯৭৩)।

১৯৭৪

বাংলাদেশ জামাতের ৫১তম সালানা জলসা ৬-৭ এপ্রিল ১৯৭৪ তারিখ মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। তখন জলসার প্রাক্কালে পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি ছিল নিম্নরূপ ঃ 'বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫১তম সালানা জলসা'

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫১তম সালানা জলসা ইনশাল্লাহ্ আগামী ৬ ও ৭ এপ্রিল, ১৯৭৪ খ্রিঃ মোতাবেক ২৩ ও ২৪ চৈত্র, ১৩৮০ বাংলা শনিবার ও রবিবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। মজলিসে আমেলার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বছর মহিলাদের জন্য কোন অধিবেশন হবে না। সুতরাং আসন্ন জলসায় দারুত তবলীগে মহিলাদের থাকা বা খাওয়ার কোন ব্যবস্থা থাকবে না। এ বছর যেহেতু দ্রব্যমূল্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেজন্য জলসার খরচও অধিকাংশে বৃদ্ধি হবে। আপনারা জানেন যে, এই জলসায় বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্ত হতে মু'মিনীন ও সত্যান্বেষীদের সমাবেশ হয়ে থাকে। এবার অন্যান্য বছরের তুলনায় লোক সমাগমও বেশি হবে, সেহেতু জলসার কার্যকে সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনের জন্য প্রায় ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকার প্রয়োজন। অতএব প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের ও বিশেষ সভ্যগণের ওপর যে টাকা ধার্য করে পত্র দেয়া হয়েছে উক্ত চাঁদা আদায় করত কেন্দ্রীয় আঞ্জুমানে সত্বর পাঠিয়ে দিয়ে আল্লাহ্ তা'লার অশেষ অনুগ্রহের অধিকারী হবেন। আমাদের এ জলসা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্থাপিত মরকযি জলসার ছায়া স্বরূপ। .....এর বন্ধুগণের অবগতির জন্য জলসার ফজিলত সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ...কাদিয়ানের জলসার বিষয়ে ঘোষণার উদ্ধৃতি দেওয়া গেল। "এটা সামান্য জলসা নয় বরং এটি ঐশী নিদর্শন মোতাবেক ইসলামের মুখ্য বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ জলসার ভিত্তি-প্রস্তর আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং নিজ হস্তে স্থাপন করেছেন।" এই দৃষ্টিভঙ্গী সম্মুখে রেখে এটাকে সাফল্য মন্ডিত করার কার্য যথাযোগ্য অংশগ্রহণ করা সকল ভাইয়ের কর্তব্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যারা জলসায় আকিকার গরু, ছাগল বা তার মূল্য বাবদ নগদ টাকা দিতে চান তা সাদরে গৃহীত হবে। জলসায় বিভিন্ন অঞ্চল হতে আহমদীগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন, এতে আকিকা দেয়ার ও দোয়া লাভের এক বিরাট সুযোগ। আকিকা ছাড়াও যদি কেউ সওয়াব হাসিলের জন্য গরু, ছাগল, চাল, ডাল, তেল, আলু ইত্যাদি জলসার উদ্দেশ্যে দিতে চান তা-ও সাদরে গৃহীত হবে।

ওয়াসসালাম–
খাকসার
(ভিজির আলী)
চেয়ারম্যান জলসা কমিটি
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া
(পাক্ষিক আহমদী ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৪)।

উক্ত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে জলসার ব্যয় নির্বাহের জন্য আশানুরূপ চাঁদা পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন জামাত থেকে অধিক সংখ্যক আহমদী যোগদান করেন। এছাড়া অনেক অ-আহমদী বন্ধুও অংশ গ্রহণ করেন। ফলে কর্মসূচি অনুসারে সফল জলসা হয়। (চলবে)

সংবাদ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ০৪/০৬/২০১৬ রোজ শনিবার বাদ আসর থেকে বায়তুল ওয়াহেদ মসজিদে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মৌ. আবু তাহের, নযম পাঠ করেন যথাক্রমে ইসতিয়াক আহমদ ও সোলেমান আহমদ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সরলতা ও পরম সহিষ্ণুতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ এ বিষয়ে জ্ঞানগর্ভমূলক বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

অতঃপর জেরে তবলীগ মেহমানদের নিয়ে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান শুরু হয়। জেরে তবলীগ মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মুবাল্লেগ ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। এতে একজন বয়আত গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ২৬৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোস্তাক আহমদ খন্দকার

নূরনগর, ঈশ্বরদিতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৭ই জুন ২০১৬ তারিখ বাদ জুমুআ নূরনগর ঈশ্বরদিতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব আশরাফ আলী খান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন তৌফিক জামান এবং আরবী কাসিদা পাঠ করেন মাসরূর রহমান। এরপর বক্তব্য রাখেন রসূলে করীম (সা.) এর চারিত্রিক গুণাবলীর ওপর জনাব সাব্বির আহমদ খান, মহানবী (সা.) এর কুরআন প্রেম এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব সালমান আহমদ পার্শী। রসূল করীম (সা.) এর শিশু সন্তানদের প্রতি ভালবাসা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সভাপতি, খাতামান নাবীঈন (সা.) এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ আল হক, ইসলামী বিবাহ শাদী সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব গিয়াসউদ্দিন মোল্লা। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ৩৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান

ঘাটুরায় ওয়াকফে নও সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২১/০৫/২০১৬ রোজ শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঘাটুরায় 'ওয়াকফে নও সম্মেলন ২০১৬' সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ১৪ জন ওয়াকফে নও ছেলে-মেয়ে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে উদ্বোধনী এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব হালিম আহমদ হাজারী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, বাংলাদেশ। সকাল ৯ টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয় এবং বিকাল ৫ টায় সভাপতির দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

মোহাম্মদ মুছা মিয়া

লাজনা ইমাইল্লাহ্ কটিয়াদির তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ২৫-২৭ মে তিন দিনব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। এতে কটিয়াদী, তেরগাতী ও বীরপাইকশা জামাতের ৭০ জন লাজনার সদস্যাগণ তালিম তরবিয়তী ক্লাসে অংশগ্রহণ করেন। কেন্দ্র হতে লাজনার দু'জন প্রতিনিধি তিনদিন উপস্থিত থেকে ক্লাস পরিচালনা করেন। শেষ দিন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে ক্লাসের সমাপ্তি হয়।

প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ কটিয়াদী

তারুয়া জামাতে মুসীয়ান সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ০৬/০৬/২০১৬ তারিখ রোজ সোমবার বাদ যোহর স্থানীয় জামে মসজিদে মুসীয়ান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন তারুয়া জামাতের সেক্রেটারী ওসীয়্যত জনাব মিজানুর রহমান। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব শাহিন আহমদ। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। নেযামে ওসীয়্যতের গুরুত্ব ও কল্যাণ এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে জনাব জহির আহমদ মিয়াজী, জনাব সামসু মিয়া ও জনাব শাহিন আহমদ মোল্লা। সবশেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলন সমাপ্ত হয়। এতে ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

জহির আহমদ মিয়াজী

কবিরপুর জামাতে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী

গত ১ জুলাই, ২০১৬ শুক্রবার কবিরপুর জামাতে দিনব্যাপী বিভিন্ন জামাতী কর্মসূচী পালিত হয়। এতে মজলিসে আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের কর্মসূচী অনুযায়ী হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) রচিত বারাহীনে আহমদীয়া যা পাক্ষিক আহমদীতে ধারাবাহিকভাবে অনুবাদ হয়ে প্রকাশিত হয়ে আসছে তা থেকে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর খিলাফত দিবস পালন করা হয়। এতে খিলাফত বিষয়ে বিভিন্ন বক্তাগণ বক্তব্য রাখেন। বাদ আসর পবিত্র কুরআন থেকে দরস প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ আবদুল জলিল । পবিত্র কুরআনের শেষ ৩টি সূরার ওপর দরস প্রদান করা হয়। সন্ধা ৬:০০ টায় হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস যে খুতবা প্রদান করেন যা এমটিএ সরাসরি সম্প্রচার করে তা উপস্থিত সদস্যরা দেখেন। এরপর কবিরপুর জামাতের ব্যবস্থাপনায় ইফতারীর আয়োজন করা হয়। এতে পুরুষ মহিলা ৩৫জন অংশগ্রহণ করেন। এশা ও তারাবীর নামায আদায় করে সকলেই নিজ নিজ গন্তব্যে ফিরে যান ।

আবু বকর সিদ্দিক

ঢাকার ওয়াকফে নও সম্মেলন সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত

গত ২৪ জুন, ২০১৬ শুক্রবার ঢাকায় দারুত তবলীগে ওয়াকফে নও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন ঢাকা, তেজগাঁও ও মিরপুর জামাতের ওয়াকফে নও ছেলেমেয়ে এবং তাদের পিতামাতাগণ। এতে ওয়াকফে নও ছেলে ৫৯ জন, মেয়ে ৫৮ জন ও তাদের পিতা ৭৪ জন ও মাতা ৪৪ জন এবং অন্যান্য সাধারণ সদস্য ছিল ২৫ জন। মোট উপস্থিত ছিল ২৬০ জন। সকাল ১১ টায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম নায়েব ন্যাশনাল আমীর জনাব মীর মোবাশ্বের আলী। কুরআন তেলাওয়াতের পর সভাপতি দোয়া পরিচালনা করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব হালিম আহমদ হাজারী। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি অধিবেশন শুরু বেলা ৩ টায়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা। ওয়াকফে নও এবং পিতামাতাদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তৃতা রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, বাংলাদেশ। সবশেষে জনাব শফিকুল হাকিম আহমদ, সহকারী সেক্রেটারী ওয়াকফে নও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও-এর দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

শফিকুল হাকিম আহমদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে নাসেরাত দিবস অনুষ্ঠিত

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে গত ২৩-০৫-২০১৬ তারিখে সকাল ১০টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সফলতার সাথে নাসেরাত দিবস পালন করা হয়। দিবসের কার্যক্রম শুরু হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে। দিবসে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন গাজালা কাউছার, রেহনুমা তারান্নুম উজালা, খালুদ কাউছার সামিয়া, আমরিন আহমদ এবং বুশরা আক্তার। শেষে সভানেত্রী দিলরুবা বেগম-এর বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে দিবস সমাপ্ত হয়।

জাকিয়া আহমদ রুমকী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নূরনগর-ঈশ্বরদী

গত ২৭/০৫/২০১৬ বাদ জুমুআ নূরনগর-ঈশ্বরদী লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে খিলাফত দিবস পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। এতে ইসলামে খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণসহ বিভিন্ন বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদস্যাগণ, যথাক্রমে মেরিনা খাতুন, লাভলী জামান, মাহমুদা জাহান জান্নাত এবং ফাল্গুনী হাবীব। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

রওশন আরা

রমযান উপলক্ষে সিলেট জামাতে তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ১২ জুন হতে ১৯ জুন মোট ৮ দিন পবিত্র রমযান উপলক্ষে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সিলেট এর উদ্যোগে তালিম তরবিয়তী ক্লাসের আয়োজন করা হয়। প্রতিদিন বিকাল ৪টা হতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত নিয়মিত ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। ১৮/০৬/২০১৬ শনিবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে আনসার, খোদ্দাম, লাজনা, নাসেরাত ও আতফালসহ মোট ২৩ অংশ নেন। ১৯/০৬/২০১ তারিখ বাদ মাগরীব সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবাইকে পুরস্কৃত করা হয়। ক্লাসে কুরআন নাযেরা, হাদীস, ইলহাম, দোয়া, অর্থসহ নামায, দীনিমালুমাত এবং মসলা মাসায়েল বিষয়ে পাঠ দান করা হয়।

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

১৫তম বিভাগীয় ওয়াকফে নও ক্লাস ও সম্মেলন সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট রিজিওনের ৪ দিনব্যাপী ১৫তম রিজিওনাল ওয়াকফে নও ক্লাস গত ২৫-২৮ মে পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ-এ সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়। ২৫ মে জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার সহকারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফেনও এর সভাপতিত্বে ক্লাস ও সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয় এবং ২৮ মে জনাব হালিম আহমদ হাজারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও এর সভাপতিত্বে ক্লাস ও সম্মেলনের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ। ক্লাসে কুরআন (মুখস্থ), অর্থসহ নামায, হাদীস শিক্ষা, আযান, ইকামত, নযম বাংলা ও উর্দু, বক্তৃতা, দ্বীনিমালুমাত, পুস্তক আলোচনা বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়। পাঠদান শেষে পরীক্ষা নেয়া হয় এবং পরস্কৃত করা হয়। ক্লাসে অত্র রিজিওনের ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঘাটুরা, তারুয়া, নাটাই, ক্রোড়া, আখাউড়া, বিষ্ণপুর ও শালগাও থেকে ৪৭ জন ওয়াকফেনও এবং ২০ জন পিতামাতা উপস্থিত থেকে ক্লাস করেন।

মোস্তাক আহমদ খন্দকার

কৃতি ভাই-বোন”

আমাদের বড় ছেলে আবিদুর রহমান (আকিব), বীরগঞ্জ সরকারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, বীরগঞ্জ দিনাজপুর হতে ২০১৫ইং সালের জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ অর্জন করে বীরগঞ্জ থানা পর্যায়ে ২য় স্থান অধিকার করে ট্যালেন্টপুলে স্কলারশিপ প্রাপ্ত হয়েছে এবং বড় মেয়ে অফিয়া ফারজানা (আনিয়া) বীরগঞ্জ মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর হতে ২০১৫ সালের ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পিএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ অর্জন করে ট্যালেন্টপুলে স্কলারশিপ প্রাপ্ত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। বর্তমানে তাঁরা উভয়ে যথাক্রমে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকায় ৯ম শ্রেণিতে এবং আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকায় ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে অধ্যয়ন করছে।

দোয়াপ্রার্থী-
মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম (রকেট) ও
সৈয়দা আবেদা মনসুরা, বীরগঞ্জ,
দিনাজপুর।

সংবাদ প্রেরণকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ

জামা'ত ও মজলিসি কর্মকাণ্ডের সংবাদ প্রেরণকালে স্পষ্টাক্ষরে এবং সংবাদ আকারে পাঠানোর জন্য সকলকে আহ্বান করা যাচ্ছে।

বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকের ওপর সেমিনার ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের কর্ম-ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে পাক্ষিক আহমদী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তক এর ওপর মাদারটেক মসজিদে গত ২০ মে, ২০১৬ শুক্রবার বাদ জুমুআ এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব এস এম রহমত উল্লাহ। সাধারণ আলোচনা ও পুস্তক পাঠের প্রয়োজনিয়তা নিয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব শফিকুল হাকিম আহমদ। এছাড়া মওলানা মাসুম আহমদ বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকের ওপর আলোচনা করেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এত ৯২ জন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া গত ৬ মে শুক্রবার বাদ জুমুআ দারুত তবলীগ মসজিদে বারাহীনে আহমদীয়ার যে অংশ পাক্ষিক আহমদীতে প্রকাশিত হয়েছে, সেই অংশের ওপর গঈছ পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। উক্ত পরীক্ষায় ২৯ জন অংশগ্রহণ করেন।

শফিকুল হাকিম আহমদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা তবলীগি আশারা

গত ২১ হতে ৩১ মে ২০১৬ লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে তবলীগি আশারা পালন করা হয়। ৪০ জন বোন তবলীগি আশারা পালন করেন। তবলীগি আশারা চলাকালে ২৪ জন বোনকে তবলীগ করা হয়।

জহুরা তাজনীন

খিলাফত দিবস

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

গত ২৭/০৫/২০১৬ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ থেকে বাইতুল ওয়াহেদ মসজিদে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে খিলাফত দিবস অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব নাছির আহমদ। নযম পাঠ করেন যথাক্রমে জনাব নুরুদ্দীন আহমদ ও জনাব কাওসার আহমদ। খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মৌলভী আবু তাহের, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে খিলাফতের ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ৩২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোস্তাক আহমদ খন্দকার

সৈয়দপুর তাহের আবাসিক প্রকল্প

গত ২৭ মে ২০১৬ সৈয়দপুর তাহের আবাসিক নতুন মসজিদে বাদ জুমুআ খিলাফত দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসে খোদ্দাম, আতফাল, আনসার, লাজনা-নাসেরাত ও শিশু সহ ৮৪ জন আহমদী এবং মেহমান ৬ জন উপস্থিত ছিলেন। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব সৈয়দ আহমদ দেওয়ান। দোয়া পরিচালনা করেন খেলাফত দিবসের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ নজিবুর রহমান, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সৈয়দপুর, নীলফামারী। নযম পাঠ করেন জনব শাকির আহমদ। বক্তৃতা পর্বে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব সৈয়দ আহমদ দেওয়ান, শাহ্ গিয়াস উদ্দীন, মওলানা শরীফ আহমদ এবং সভাপতি। দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি হয়।

শাহ্ গিয়াস উদ্দীন

পটুয়াখালী

গত ০৩/০৬/২০১৬ তারিখ বাদ জুমুআ খিলাফত দিবস পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন যয়ীম আব্দুল ওহাব মুন্সী। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব রাজন আহমদ শিকদার। বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব কাইয়ুম হাওলাদার। খিলাফত দিবসের গুরুত্ব, কল্যাণ ও নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত ব্যবস্থা বিষয়ের ওপর পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন মৌ. তৌহিদুল ইসলাম, শাহজালাল মুন্সী, রেজওয়ানা তৌহিদ, নুসরাত আহমদ, মওলানা নওশাদ আহমদ এবং স, ম দেলোয়ার হোসেন। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এতে ২৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

মওলানা নওশাদ আহমদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘাটুরা

গত ২৯/০৫/২০১৬ রোজ রবিবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘাটুরার উদ্যোগে খিলাফত দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসে সভাপতি ছিলেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট সাহেবা। এতে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভাপতির বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। দিবসে ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মরিয়ম ছিদ্দিকা

কটিয়াদী

গত ২৭/০৫/২০১৬ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ কটিয়াদী জামাতে খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট এম.এ. হান্নান। কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌ. আব্দুল মান্নান। নযম পেশ করেন মাসরুর আহমদ উৎস। এতে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব ডা. রুহুল আমীন, এডভোকেট আজীজুল হক, মওলানা রাসেল সরকার। সবশেষে সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

এম. এ. হান্নান

তেরগাতী

গত ২৭/০৫/২০১৬ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ তেরগাতী জামাতে খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব আশরাফ উদ্দিন ছোটন। নযম পরিবেশন করেন দুর্জয় আহমদ তুষার ও জনাব মাসরুর আহমদ উৎস। এতে বক্তব্য রাখেন জনাব আনছার আহমদ পায়েল এবং জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

সৈয়দ তোফায়েল আহমদ

আনসারুল্লাহ্ ফাজিলপুর

গত ১০/০৬/২০১৬ খিলাফত দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় জামাতের যয়ীম জনাব রেজোয়ানুল হক খানের সভাপতিত্বে মহান খিলাফত দিবস পালন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ রেজোয়ানুল হক খান। এতে আলোচনা করেন সভাপতি ও মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

মোহাম্মদ রেজোয়ানুল হক খান

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তরবিয়তী অধিবেশন

গত ০৫/০৫/২০১৬ তারিখ রোজ রবিবার বাদ আছর থেকে বাইতুল ওয়াহেদ মসজিদে আহমদীয়া মুসলিম জামাত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে তরবিয়তী অধিশেন অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভপতিত্ব করেন জনাব মঞ্জুর হোসেন, আমীর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন কাওসার আহমদ মঞ্জুর, নযম পাঠ করেন জনাব আফতাব আহমদ। অতঃপর তরবিয়ত এর ওপর বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী ও সভাপতি। এতে ২০০ জন উপস্থিত ছিল।

মোস্তাক আহমদ খন্দকার

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত গত ১৫ জুলাই, ২০১৬ জুমুআর খুতবার সংক্ষিপ্তরূপ।

গত ১৫ই জুলাই, ২০১৬ রোজ শুক্রবার হুযূর আনোয়ার (আই.) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায়জামাতের কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব এবং করণীয় সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন।

হুযূর বলেন, সম্প্রতি বিশ্বের সব দেশের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় জামাতের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। অনেকেই পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন আবার অনেক নতুন মুখও এবার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে অর্পিত এই দায়িত্বের গুরুত্ব অনুধাবন করে তা যথাযথভাবে পালনের তৌফিক দান করুন।

এরপর হুযূর জামাতের কর্মকর্তাদের আদর্শ এবং বৈশিষ্ট্য কীরূপ হওয়া উচিত তা বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআন ও হদীসের আলোকে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা অঙ্গীকার পালন ও আমানত রক্ষা করার প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

মহানবী বলেন, জাতীর নেতা মূলত জাতীর সেবক হয়ে থাকে। আর পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, যারা নিজেদের ধর্মীয় ভাইদেরকে নিজেদের প্রাণের ওপর প্রাধান্য প্রদান করেন তারাই সত্যিকার মু'মিন।

মু'মিনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, তারা বিনয় ও নম্রতার সাথে পৃথিবীতে জীবন যাপন করে। তারা অধিকার নেওয়ার পবিবর্তে অন্যের অধিকার প্রদানে সদা সোচ্চার। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে অগ্রগণ্য রেখে মু'মিনরা অন্যের অধিকার প্রদানে সচেষ্ট থাকে। আর যথাযথভাবে খোদার ইবাদতেও তারা মশগুল থাকে।

মহানবী (সা.) বলেন, মানুষ যতবেশি বিনয় অবলম্বন করে আল্লাহ্ ততবেশি তার সম্মান বৃদ্ধি করেন। পদাধিকারীদের কাজে-কর্মে বিনয় প্রকাশ না পেলে তারা খোদার কৃপারাজি থেকে বঞ্চিত হবে। তাদের কাজে কোন বরকত হবে না আর তারা সাফল্যের মুখও দেখবে না।

হুযূর (আই.) আরো বলেন, হুযূর বলেন, জামাতের সব কর্মকর্তার উচিত জামাতের রুলস ও রেগুলেশন বই পড়া এবং নিজের কর্মগণ্ডি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা তাহলে সবার জন্য দায়িত্ব পালন সহজ হয়ে যাবে।

হুযূর সেক্রেটারী তরবীয়তের কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, যদি জামাতের তরবীয়ত বিভাগ সক্রিয় হয় তাহলে অন্যান্য বিভাগের কাজও সহজ হয়ে যায়। নিজের ঘর ও পরিবার থেকে তরবীয়ত আরম্ভ করতে হবে। আর সর্বোপরি মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও ভালোবাসা থাকতে হবে তাহলে জামাতের সাধারণ সদস্যদের ওপর এর সুপ্রভাব পড়বে এবং জামাতী দায়িত্ব পালন তাদের জন্য সহজতর হবে। কর্মকর্তাদের মধ্যে ত্যাগের মন-মানসিকতা থাকলে সাধারণ সদস্যদের ওপর এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে আর মানুষের মধ্যে ধর্মসেবার আগ্রহ জন্মে।

হুযূর বলেন, জামাতের কর্মকর্তা হিসেবে আপনি অন্যকে যা বলছেন তা যদি নিজে করে দেখান তাহলে তা আপনার ও জামাতের জন্য কোনভাবেই কল্যাণ বয়ে আনবে।

হুযূর (আই.) বলেন, যতবড় পদ ততবেশি বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন আবশ্যক যাতে জামাতের সদস্যরা আপনার আচার-ব্যবহার ও বিনয় দেখে ধর্ম সেবায় অনুপ্রাণিত হয়। এভাবে জামাতের মধ্যে কর্মীবাহীনি সৃষ্টি হবে। জামাতেই কখনোই কর্মীরঘাটতি দেখা দেবে না।

তবে মনে রাখবেন, ধর্মসেবার সুযোগ দিয়ে আল্লাহ্ আমাদেরকে ধন্য করেছেন নতুবা জামাতের কাজের জন্য আল্লাহ্ কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন। কারো মাথায় যেন একথার উদ্রেগ না ঘটে যে, আমি ছাড়া জামাতের কাজ হবে না।

হুযূর (আই.) জামাতের মুরব্বী এবং মুবাল্লিগদেরও স্ব-স্ব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের প্রতি আহ্বান জানান এবং জামাতের কোন কর্মকর্তা যদি কেন্দ্রের নির্দেশ পালনে দুর্বলতা দেখায় তাহলে তাকে তা স্মরণ করাতে বলেন। মনে রাখতে হবে, আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ অঙ্গীকার ও আমানত সম্পর্কে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে।

আল্লাহ্ আমাদের অতীতের সব দুর্বলতা ও আলস্য ক্ষমা করুন। এবং আমাদের সবাইকে নবোদ্যমে অর্পিত দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার তৌফিক দিন।

সাধারণ মানুষের সাথে সদা হাসিমুখে কথা বলা, তাদের সাথে কোমল ও দয়ার্দ্র আচরণ প্রদর্শন করাও জামাতের পদাধিকারীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত।

প্রত্যেক আমীর, প্রেসিডেন্ট ও পদাধীকারীকে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে আদর্শ স্থানীয় হতে হবে। তাদের কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ অঙ্গীকার ও আমানত সম্পর্কে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে।

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২ অক্টোবর, ২০১৫ ইং, রোজ শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবায় নিম্নোক্ত তিনটি দোয়া বেশি বেশি পড়ার প্রতি জামা'তের সকল সদস্যকে নসীহত প্রদান করেন।

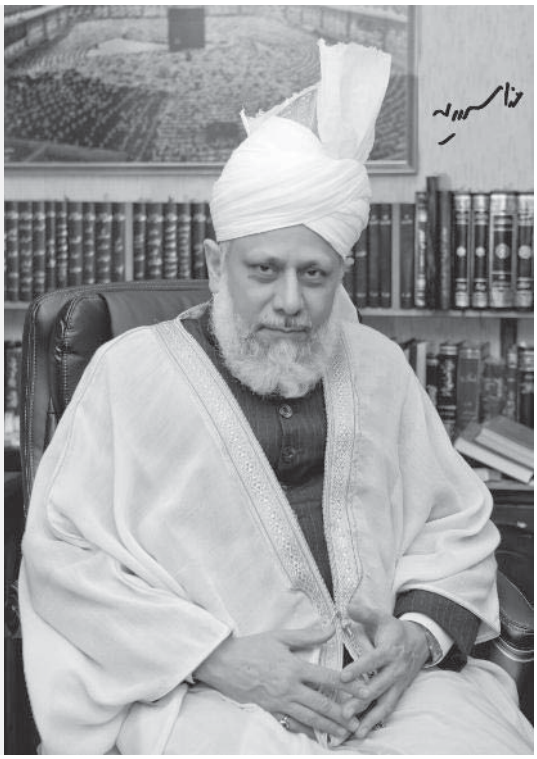

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ
رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।"

অর্থ : হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ
وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ
حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۲﴾

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার।"

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

*** এছাড়া হুযূর (আই.) ইস্তেগফার করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ : আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 79 | 2nd Issue
The Ahmadi Fortnightly
Since 1922
31st July, 2016
Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগেই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"দিল মেঁ য়্যাহী হ্যা হার্‌দাম তেরা সাহীফা চুমুঁ
কুরআঁ কে গিরদ্ ঘুমুঁ কা'বা মেরা য়্যাহী হ্যা"

আমার আন্তরিক বাসনা হলো, সর্বদা যেন তোমার কিতাব চুম্বন করি আর কুরআনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি; বস্তুত আমার কা'বা এটাই।

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময় সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com